প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- **কোরআনের তাফসীরে বুদ্ধিবৃত্তির প্রমাণ্যতা**

  ডক্টর ফাতহুল্লাহ নাজ্জারযাদেগান

- **মহানবী (সা.) এর ‘আহলে বাইত’ এর পরিচয়**

  ডক্টর ফাতহুল্লাহ নাজ্জারযাদেগান

- **মহানবী (সা.)-এর নির্ভুলতার দাবি ও খেজুর গাছের পরাগায়নের হাদিস**

  এ কে এম আনোয়ারুল কবীর

- **শিশু ও যুবকদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আচরণ**

  মুহাম্মাদ আলী চানারানী

- **আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নে সাবা’র ওপর একটি পর্যালোচনা**

  আসাদ্‌ হায়দার্‌

- **রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন একনিষ্ঠ যুবক সাহবী**

  মুহাম্মাদ আলী চানারানী

বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩-৪, অক্টোবর ২০১৭ - মার্চ ২০১৮

بسم الله الرحمان الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩-৪

অক্টোবর ২০১৭-মার্চ ২০১৮

সম্পাদক : এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর

সহযোগী সম্পাদক : ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক : মো. আশিফুর রহমান

উপদেষ্টামণ্ডলী : মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

এস.এম. আশেক ইয়ামিন

প্রকাশক : মো. আশিকুর রহমান

প্রকাশকাল : কার্তিক - চৈত্র ১৪২৩

রজব - যিলহজ ১৪৩৮

মূল্য : ১০০ (একশ) টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা : বাড়ি # বি-৭, ফ্ল্যাট ২০১,

মানসী লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, শাইনপুকুর, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল : ০১৯১২১৪৫৯৬৫

Prottasha (Vol. 7, No. 3-4, October 2017- March 2018), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman;

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**

ইসলাম জুলুম ও অত্যাচারের অবসান কামনা করে ৭

- **ধর্ম ও দর্শন**

কোরআনের তাফসীরে বুদ্ধিবৃত্তির প্রমাণ্যতা ১১

ডক্টর ফাতহুল্লাহ নাজ্জারযাদেগান

মহানবী (সা.) এর 'আহলে বাইত' এর পরিচয় ৩০

ডক্টর ফাতহুল্লাহ নাজ্জারযাদেগান

মহানবী (সা.)-এর নির্ভুলতার দাবি ও খেজুর গাছের পরাগায়নের হাদিস ৫৫

এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর

শিশু ও যুবকদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আচরণ ৭৯

মুহাম্মাদ আলী চানারানী

- **পর্যালোচনা**

আব্দুল্লাাহ ইব্নে সাবা'র ওপর একটি পর্যালোচনা ৯৩

আসাদ্ হায়দার্

- **জীবনী**

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন একনিষ্ঠ যুবক সাহাবী ১৩৩

মুহাম্মাদ আলী চানারানী

Prottasha

A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 7, No. 3-4, October 2017 – March 2018

Table of Contents

- **Editorial**

Islam Intends to Irradiate Oppression 7

- **Theology and Philosophy**

Prove of Using Intellectuality in the Case of Tafsir 11
Dr. Fathullah Najjarzadehgan

Identity of Ahl-ul Bayt of Rasulullah (sm.) 30
Dr. Fathullah Najjarzadehgan

Infallibility of Prophet (sm.) and the Hadith of Polination 55
A.K.M. Anwarul Kabir

Prophet’s Attitudes Toward Children and Youth 79
Muhammad Ali Chanarani

- **Review**

Review on the Biography of Abdullah ibn Sabah 93
Asad Haider

- **Biography**

Some Sincere Young Companions of Prophet (Sm.) 133
Muhammad Ali Chanarani

গ্রাহক চাঁদার হার		
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	১২০ টাকা (প্রতি কপি)	২৪০ টাকা (বাৎসরিক)

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :
মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-বি-৭ ফ্লাট-২০১, মানসী লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, শাইনপুকুর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

ইসলাম জুলুম ও অত্যাচারের অবসান কামনা করে

সম্পাদকীয়

ইসলাম জুলুম ও অত্যাচারের অবসান কামনা করে

মহান আল্লাহ তাঁর নবিদের সকলকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে নবিদের এ মিশনকে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন : 'নিশ্চয় আমরা আমাদের রসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি যাতে মানুষ ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে।' (হাদীদ : ২৫) এ আয়াতের ভিত্তিতে শুধু নবিরা নন; বরং সকল মানুষের দায়িত্ব হলো ন্যায়কে সমর্থন দান ও এর প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এজন্যই ইসলাম যুদ্ধের সময়ও শত্রুর প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণ করার আদেশ দিয়েছে এবং তাদের সাথে সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করতে নিষেধ করেছে (বাকারা : ১৯০), এমনকি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী গোষ্ঠীর প্রতিও ন্যায়পরায়ণ থাকতে বলেছে। (মায়িদা : ২) যদি কেউ কারো প্রতি অন্যায় করে থাকে তাকেও শুধু ততটুকুই প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে যতটুকু অবিচারের শিকার হয়েছে। (নাহল : ১২৬)

ইসলাম সকল প্রকার অন্যায় ও অবিচারের বিরোধীই শুধু নয়; বরং এর মূলোৎপাটন চায়। তাই পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে : তোমরা জুলুম ও অবিচার কর না এবং জুলুমের শিকার হয়ো না (জুলুমকে মেনে নিও না)। (বাকারা : ২৭৯) আর জুলুমকে প্রশ্রয় না দিয়ে পরস্পরের সহযোগিতা গ্রহণ করে জুলুমকে প্রতিরোধ করতে বলা হয়েছে। (শূরা : ৩৯-৪১) হযরত আলী (আ.) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আমি পুনঃপুন বলতে শুনেছি যে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি পবিত্রতার মর্যাদা লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না তাদের দুর্বল ও অসহায়রা দ্বিধাহীন ও নির্ভয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাশীলদের থেকে তাদের অধিকার আদায় করতে পারে। (নাহজুল বালাগাহ, পত্র ৫৩) হযরত আলী (আ.) অন্যত্র বলেছেন : সবচেয়ে নিকৃষ্ট জুলুম হলো দুর্বলদের (অসহায় নারী-পুরুষ ও জাতি) ওপর জুলুম। (নাহজুল বালাগাহ, পত্র ৩১)

বর্তমানে পৃথিবীতে সর্বত্র ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রগুলো দুর্বল মানুষ ও জাতিগুলোর ওপর জুলুম, অত্যাচার ও আগ্রাসন চালাচ্ছে। দুঃখজনকভাবে একদল মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা এ অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা সাম্রাজ্যবাদী ও যায়নবাদী গোষ্ঠীর সাহায্য গ্রহণ করছে। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন : জালিমরা জুলুমের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করে। (জাছিয়া : ১৯) আর একদল সুবিধাবাদী ও দুনিয়াকামী দরবারী আলেম অত্যাচারী শাসকদের সকল অপকর্মকে বৈধতা দানের চেষ্টা করছে। এরাই ঐতিহাসিকভাবে ইয়াযীদের মত শাসকদের সমর্থন দান ও পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। তারা পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করে এ সকল জালিম শাসককে আল্লাহর মনোনীত (উলিল আম্‌র) বলে প্রচার করছে এবং শত-সহস্র জুলুম সত্ত্বেও তাদের আনুগত্যকে নিঃশর্তভাবে অপরিহার্য হওয়ার সপক্ষে ফতওয়া দিচ্ছে। ইমাম খোমেইনী (রহ.)

এ ধরনের শাসক ও দরবারী আলেমদের সম্পর্কে বলেছেন : ‘(ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে) পবিত্র কোরআন জালিম শাসক এবং তাদের সমর্থক তাগুতদের থেকেও নিকৃষ্ট আলেমদের হাতে মহান আল্লাহর শত্রুদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্যায়, অবিচার ও সীমালঙ্ঘনমূলক কর্মকে প্রতিষ্ঠা দানের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।’ অথচ মহান আল্লাহ্ কেবল পুণ্যকর্মশীলদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছেন। (আম্বিয়া : ১০৫) এবং তাঁর সকল নবিকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে প্রেরণ করেছেন। (হাদীদ : ২৫) আর এ লক্ষ্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ ইবরাহিম (আ.)-কে জালিম নমরূদ এবং মূসা (আ.)-কে তাগুত ফিরআউনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক (ত্বীন : ৮) বলে উল্লেখ করেছেন যিনি তাঁর বান্দাদের ওপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। (নিসা : ৪০) সুতরাং কখনই ঐ মহান আল্লাহ জালিমদের শাসনকে বৈধতা দান করতে পারেন না। এখন সে শাসক নিজেকে ‘আমিরুল মুমিনুন’ বা ‘খলিফাতুল মুসলিমীন’ বলে দাবি করুক বা ‘খাদেমুল হারামাইন’। মুসলমানদের ভাগ্য তাদের হাতে সমর্পণ করার সপক্ষে কোন দলিল নেই। এর বিপরীতে মহান আল্লাহ্ এ ধরনের শাসকদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের আনুগত্যকে অবৈধ হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন : ‘আর তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশের আনুগত্য কর না যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও অনাচার করে বেড়ায়।’ (শুয়ারা : ১৫১)

ইসলাম ব্যক্তিগত ও পারিবরিক ক্ষেত্রেও জুলুমকে নিন্দনীয় কর্ম বলে বিবেচনা করেছে। পরিবারে পুরুষের নারীর প্রতি অন্যায় আচরণ করার কোন অধিকার নেই। আল্লাহ বলছেন : তোমরা (পুরুষ) তাদের (স্ত্রী) ওপর সংকীর্ণতা আরোপ করে কষ্ট দিও না। (তালাক : ৬) ইসলামে স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে আটকে রাখাকে জুলুম ও সীমালঙ্ঘনমূলক কর্ম বলে বিবেচনা এবং এরূপ করা আল্লাহর আয়াতকে নিয়ে উপহাসের শামিল গণ্য করা হয়েছে। (বাকারা : ২৩১) কোরআনে আল্লাহ পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের প্রাপ্য উত্তরাধিকারের পরিমাণ উল্লেখের পর সেটাকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বলে ঘোষণা করে তা লঙ্ঘন করা জাহান্নামের লাঞ্ছনাকর শাস্তির কারণ বলেছেন। (নিসা : ১৩-১৪) ইয়াতিমদের উত্তরাধিকার প্রদান না করে অন্যয়ভাবে তা আত্মসাৎ করাকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তির কারণ বলা হয়েছে। (নিসা : ১০)

সামাজিক ক্ষেত্রেও যেন কোন দল ও গোষ্ঠী শত্রুতার বশবর্তী হয়ে অপর দলের ওপর অন্যায় না করে, বরং সকল অবস্থায় নিরপেক্ষ থেকে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করে তার প্রতি আল্লাহ তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন এবং একে আল্লাহভীতির পরিচয় বলেছেন। (মায়িদা : ৮) এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহভীতি না থাকলেই মানুষ জুলুম ও অন্যায় করে। সুতরাং ইসলাম ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে জুলুমকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তির উপযুক্ত মহাপাপ বলে ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে অধিকার নির্ধারণ করেছেন তাকে শরীয়তের পরিভাষায় ‘হাক্কুন্নাস’ অভিহিত করা হয়েছে এবং যে কেউ তা হরণ করলে তা ক্ষমার অযোগ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। অতএব, আমাদের এ অধিকারগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া আবশ্যক। নতুবা মহাশাস্তি আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। আল্লাহ আমাদের জুলুম থেকে বেঁচে থাকা এবং এ অধিকারগুলো রক্ষা করে চলার তওফিক দিন। আমীন।

ধর্ম ও দর্শন

কোরআনের তাফসীরে বুদ্ধিবৃত্তির প্রামাণ্যতা

মহানবী (সা.)-এর ‘আহলে বাইত’ এর পরিচয়

মহানবী (সা.)-এর নির্ভুলতার দাবি ও খেজুর গাছের পরাগায়নের হাদিস

শিশু ও যুবকদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আচরণ

কোরআনের তাফসীরে বুদ্ধিবৃত্তির প্রামাণ্যতা

ডক্টর ফাতহুল্লাহ নাজ্জারযাদেগান

বুদ্ধিবৃত্তি (আক্‌ল) শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে এ শব্দটি عقال بعير অর্থাৎ ‘উটের পায়ের বন্ধন’ থেকে নেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে উটের পায়ের ওপরের অংশ বাঁধা হয় যাতে উটকে নড়াচড়া থেকে বিরত রাখা যায়। বুদ্ধিমান মানুষও ঠিক তেমনি নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যা কিছুই তার মধ্যে উন্মাদনার সৃষ্টি করে এবং তাকে বিচার বুদ্ধিহীনতার দিকে প্ররোচিত করতে পারে তা থেকে বিরত রাখে। এ শব্দটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ‘অনুধাবন ও চিন্তাশক্তি’ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ ‘আকল’ হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ এক শক্তি যার মাধ্যমে মানুষ স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞানে (self provided or self evident knowledge) এবং বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান (Analytical knowledge) অর্জন করে। অন্যভাবে বলা যায়, আক্‌ল হলো ঐ মাধ্যম যা বহির্জগতে বিদ্যমান স্বয়ংসিদ্ধ ও বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানকে মানুষের জন্য অনুধাবনযোগ্য করে।[১] বুদ্ধিবৃত্তির একটি পর্যায় হলো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ঐ শক্তি যার মাধ্যমে সে কল্যাণ ও অকল্যাণ, সত্য ও মিথ্যা এবং সঠিক ও ভুল পথের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে।[২] যেহেতু বক্ষমান প্রবন্ধে তাফসীরের ক্ষেত্রে আক্‌লের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে সেহেতু এখানে আক্‌লের সংজ্ঞাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার প্রয়োজন মনে করছি না।

---

১. দ্রষ্টব্য : ইব্রাহিম আনিস, আল মো’জামুল ওয়াসিত, পৃ. ৬১৭; মুঈন, মুহাম্মাদ, ফারহাঙ্গ, ‘আক্‌ল’ শব্দের আলোচনায়; সাদরুদ্দীন সিরাজী, আল হিকমাতুল মুতাওয়ালিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১৩-৫১৪; মাজলিসী, মুহাম্মাদ বাকির, মিরআতুল উকুল, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫; গাজ্জালী, মুহাম্মাদ, আল মুসতাসকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭।

২. দ্রষ্টব্য : তাবাতাবায়ী, মুহাম্মাদ হুসাইন, আল মিজান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫ এবং ১৫ তম খণ্ড, পৃ. ১২২।

ভূমিকা

যে বিষয়টি কোরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে আক্লের প্রামাণ্যতার আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত এবং উক্ত বিষয়ক প্রশ্নের জট উন্মোচনের জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে তার মূল 'আদ্ল' (ন্যায়বিচার) এর আলোচনায় নিহিত যা কালামশাস্ত্রের (Theology) একটি বিষয়। কোন কোন মুসলিম চিন্তাবিদের মতে, ন্যায়বিচার সম্পর্কিত জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক যে কোন আলোচনার মূল সর্বপ্রথম কোরআনে অন্বেষণ করতে হবে। কেননা, মহাগ্রন্থ কোরআনই ন্যায়বিচারের বীজ মানবজাতির অন্তরে বপন করেছে এবং পানি সিঞ্চন করে তাকে সজীব ও বিকশিত হতে সাহায্য করেছে। কোরআন এ বিষয়টির প্রতি যে গুরুত্ব দিয়েছে ও স্পর্শকাতরতা দেখিয়েছে তা যেমন চিন্তাগত ও দার্শনিক গবেষণার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে তেমনি ব্যবহারিকভাবে আমাদের জীবন ও সমাজে তা বাস্তবায়নের অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত করেছে। কোরআনের যে সকল আয়াত বিশ্ব ও সৃষ্টিজগৎ ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেছে এবং যে সকল আয়াত বিশ্বে বিদ্যমান ভারসাম্য ঐশী পরিচালনা ও কর্তৃত্ব ন্যায়ভিত্তিক হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে বলে উল্লেখ করেছে তার সবই উক্ত দাবিকে সত্যায়ন করছে... ।[১]

এ কারণেই তাফসীরের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির প্রামাণ্যতার বিষয়ে মৌলিক আলোচনা প্রথমে কালামশাস্ত্রে (অতঃপর দর্শনে) উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও কিছুসংখ্যক মুসলিম লেখক ও প্রাচ্যবিদ কোনরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই এবং গবেষণা ও পর্যালোচনা ব্যতিরেকেই শিয়ারা এ ক্ষেত্রে মুতাজিলাদের অনুসরণ করেছে বলে দাবি করেছেন।[২] অথচ শিয়া মনীষীরা অন্য সকল ব্যক্তি এবং অন্য সকল কিছুর চেয়ে এক্ষেত্রে আহলে বাইতের হাদিসের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছেন, এমনকি এ বিষয়ে তাঁরা অন্যদের চেয়ে

---

১. দ্রষ্টব্য : মুতাহহারী, মুরতাজা, আদলে ইলাহী (ভূমিকা), পৃ. ২৫-২৬। তিনি উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোকে এনেছেন– আলে ইমরান ১৮, আর রাহমান ৯, হাদীদ ২৬, আরাফ ২৯, বাকারা ১২৪ ও ২৮২, মায়েদা ৩ ও তালাক ৩। অতঃপর বলেছেন : পবিত্র কোরআনে তাওহীদ, কিয়ামত, নবুওয়াত, ইমামত ও নেতৃত্ব ইত্যাদি মৌলিক বিশ্বাসের বিষয়সমূহ সহ ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল লক্ষ্য আদল ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোরআনী ন্যায়বিচার তাওহীদের সমপর্যায়ে স্থান পেয়েছে, কিয়ামতের ভিত্তি বলে গণ্য হয়েছে। ঐশী ন্যায়বিচারের মধ্যেই নবুওয়াতের লক্ষ্য এবং ইমামতের দর্শন নিহিত। আবার ব্যক্তির পূর্ণতা ও সমাজের সুস্থতার (ক্রটিহীনতার) মানদণ্ড হলো এই ন্যায়বিচার। প্রাগুক্ত

২. আমরা পরবর্তীকালে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

অগ্রবর্তী ছিলেন। এ কারণেই কোন কোন গবেষক এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মুতাজিলারা এ ক্ষেত্রে শিয়াদের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। (আমরা এ আলোচনায় এ বিষয়টিও উল্লেখ করব)।

তাফসীরের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি (আক্ল) লব্ধ জ্ঞানের ব্যবহার

তাফসীরের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিলব্ধ জ্ঞানের প্রামাণ্যতার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে কেউই প্রত্যাখ্যান করে নি অর্থাৎ শিয়া মনীষিগণ এবং সুন্নি কালামশাস্ত্রবিদদের দুই দলের (আশআরী ও মুতাজিলী) কেউই বুদ্ধিবৃত্তিকে অস্বীকার করেন নি। তাঁদের সকলেই বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানকে তাফসীরের ক্ষেত্রে একটি পর্যায় পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন এবং কখনও কখনও কোনরূপ প্রমাণ উপস্থাপন ব্যতিরেকেই জ্ঞানের এই উৎসকে তাফসীরের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। আমরা এর ওপর ভিত্তি করে এই আলোচনাকে বুদ্ধিবৃত্তির সর্বগ্রাহ্য ক্ষেত্রসমূহ এবং বুদ্ধিবৃত্তির গ্রহণযোগ্যতার বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ এ দু'ভাগে ভাগ করেছি।

বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহারের সর্বগ্রাহ্য ক্ষেত্রসমূহ

বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহারের সাধারণ ক্ষেত্রসমূহ হলো নিম্নোক্ত বিষয় :

স্বতঃসিদ্ধ বিষয়সমূহ অনুধাবনের শক্তি ও মাধ্যম হিসেবে আক্ল

এই অর্থে শিয়া-সুন্নি উভয় মাযহাবই বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন এবং বুদ্ধিবৃত্তির এ দিকটিকে কোরআনের আয়াতসমূহ বোঝার ক্ষেত্রে অন্যতম সহযোগী বিচ্ছিন্ন দলিল (قرينه منفصل) হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কারণ, এ বিষয়টি গ্রহণ করা ব্যতিরেকে কোরআনের আয়াতের অর্থ করা সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনে বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিতে রূপক অর্থের শব্দসমূহের ব্যবহার পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়েছে এবং এরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরোপিত বা তুল্য বিষয়টি রূপক হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ হলো স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান (সর্ববোধগম্য জ্ঞান) যেমন, পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ

‘যারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতাকে ক্রয় করেছে, অতএব, তাদের ব্যবসা (তাদের জন্য) লাভজনক হয় নি এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় নি।’[১]

এ আয়াতটির ক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনজ্ঞাত এ জ্ঞানের (তত্ত্ব) ওপর নির্ভর করা হয়েছে যে, লাভ ও ক্ষতির বিষয়টি ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ব্যবসায়ের সঙ্গে নয়। তাই বলা যেতে পারে, উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহর উদ্দেশ্য ব্যবসায়ের লাভ না হওয়া নয়। তাই আয়াতের ‘ব্যবসা লাভজনক হয় নি’ অংশে লাভ না হওয়ার বিষয়টি ব্যবসায়ের সঙ্গে রূপক অর্থে সংযুক্ত ও ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ মুনাফিকদের লাভ না করার অর্থ হলো হেদায়াতের পথ পরিত্যাগ করে পথভ্রষ্টতার পথকে গ্রহণ (ও পরিণতিতে আখেরাতের চিরন্তন ক্ষতিতে পতিত হওয়া)। অনুরূপ নিম্নোক্ত আয়াতে

... فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ ...

‘অতঃপর আমরা বললাম : তোমরা লাঠি দ্বারা পাথরটিকে আঘাত কর, ফলে তার থেকে বারটি ঝরনা উদ্গাত (ও প্রবাহিত) হলো’[২]– ‘সে (মূসা) তার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করল’ অংশটি উহ্য রয়েছে এবং তাতে শুধু আল্লাহর আঘাত করার নির্দেশটি বর্ণিত হয়েছে। উহ্য অংশটি বোঝার দায়িত্ব বুদ্ধিবৃত্তির স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তি কোনরূপ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই বুঝতে পারে বারটি ঝরনা পাথরের ওপর হযরত মূসা (আ.)-এর আঘাতের পরই ঘটেছে। তেমনি সূরা ইউসুফের ৩৩ নং আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে : ‘নিশ্চয়ই আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখেছি যে, আমি মদ নিংড়াচ্ছি।’ নিঃসন্দেহে আলোচ্য আয়াতে বাক্যটির উদ্দেশ্য মদ নিংড়ানো নয়, কারণ, মদ নিংড়ানোর যোগ্য কোন বস্তু নয়; বরং আয়াতের উদ্দেশ্য এটা বলা যে, মদ তৈরির জন্য আঙ্গুর নিংড়াচ্ছি। এরূপ অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

ব্যাখ্যা করার মাধ্যম হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তি (আক্‌ল)

এ অর্থে বুদ্ধিবৃত্তি কোন কোন আয়াতের বিষয়বস্তুকে সূক্ষ্মভাবে ও পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে। এ ক্ষেত্রে আক্‌লের কাজ হলো যুক্তিবিদ্যার ন্যায় পদের (Syllogism) বিভিন্ন

---

[১] সূরা বাকারা : ১৬।

[২] সূরা বাকারা : ৬০

রূপ [আশ্রয় বাক্য (Premise) ও মধ্যপদের (Middle Term) ওপর ভিত্তি করে যে চারটি রূপ পরিগ্রহ করে] এবং উক্তিসমূহের (Propositions) বিন্যাসের বিভিন্ন সম্পর্কের ছাঁচে কেরাআনের আয়াতসমূহকে সঠিকভাবে সাজানো এবং তা থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। বিপরীতধর্মী প্রতিপাদ্য যুক্তির (Proof by reduction absurdum ev contradictory absurdity) মাধ্যমেও কখনও কখনও কোরআনের আয়াত থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতের ক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী প্রতিপাদ্য যুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে–

أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَـٰلِقُونَ ﴿٣٥﴾

‘তারা কি কোন কিছু ব্যতিরেকে (অর্থাৎ স্রষ্টা ব্যতীতই) সৃষ্টি হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই কি (নিজেদের) স্রষ্টা।’[১]

এই আয়াতটিতে আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহর (স্রষ্টার) অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে।

যুক্তিবিদ্যার ছকে আয়াতটিকে এভাবে সাজানো যায় : হয় মানুষ কোন কিছু ব্যতিরেকেই (স্রষ্টা ব্যতীতই) অনস্তিত্ব থেকে (এমনিতেই) অস্তিত্ব লাভ করেছে অথবা সে নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা অথবা সে অন্য কারো দ্বারা (সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক) সৃষ্ট হয়েছে। যেহেতু প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তি দু’টি ভুল এবং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা গ্রহণ করতে (সঠিক বলতে) পারে না। সুতরাং নিশ্চিতভাবে তৃতীয় উক্তিটি সঠিক বলে গণ্য হবে অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টিকর্তা রয়েছে।[২]

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ

‘যদি (আকাশ ও পৃথিবী) এতদুভয়ের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আরো উপাস্য থাকত তাহলে নিশ্চয় তারা উভয়ে (আসমান ও জমীন) ধ্বংস হয়ে যেত।’[৩]

---

১. সূরা তুর : ৩৫।

২. অবশ্য এই আয়াতটির ক্ষেত্রে বিপরীত প্রতিপাদ্য যুক্তি প্রয়োগ এই শর্তের অধীনে যে, আয়াতে উল্লিখিত ‘কোন কিছু’কে আমরা ‘স্রষ্টা’ অর্থে ধরি এবং এ অর্থটিই আয়াতের উদ্দেশ্য হওয়ার পেছনে শক্তিশালী দলিল রয়েছে। যদিও ‘কিছু’র অর্থ কী হবে সে সম্পর্কে পূর্বোক্ত সম্ভাবনা ব্যতীত অন্য দু’টি সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছে, কিন্তু তার কোনটিই আয়াতের শেষাংশের সঙ্গে সংগতিশীল নয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন : মিসবাহ, মুহাম্মাদ তাকী, মায়ারেফে কুরআন, খোদা পরিচিতি, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫।

৩. সূরা আম্বিয়া : ২২।

এই আয়াতটিতে তাওহীদ বা একত্ববাদের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে যা ‘পরস্পর প্রতিবন্ধকতার যুক্তি’[১] বা ‘পারস্পরিক কর্ম বিঘ্নতার যুক্তি’ নামে প্রসিদ্ধ। এই যুক্তিটির প্রথমে (অর্থাৎ আয়াতের প্রারম্ভে) একটি বাক্য ভূমিকা (যুক্তিবিদ্যার ভাষায় আশ্রয় বাক্য) হিসেবে ধরে নিতে হবে যা উহ্য রয়েছে এবং তা হলো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান রয়েছে ও তাতে কোন বিশৃঙ্খলা নেই। অথচ যদি এ দু’য়ের মধ্যে একাধিক উপাস্য থাকত তবে তাদের ইচ্ছাগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্বে যে কর্মবিঘ্নতার সৃষ্টি হতো তাতে বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু তা হয় নি। সুতরাং বিশ্বে একাধিক উপাস্য নেই। অবশ্য যদি একাধিক উপাস্য থাকত তবে কেন বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যেত অর্থাৎ একাধিক উপাস্য থাকা ও বিশ্বজগৎ ধ্বংস হওয়ার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয়টির ব্যাখ্যা কিরূপ সে বিষয়ে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে যুক্তি উপস্থাপনের ধরনে পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তারা সকলেই এই বুদ্ধিবৃত্তিক (প্রথমোক্ত অর্থে) দলিলের সপক্ষে যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে আয়াতটিকে ব্যাখ্যার প্রয়াস চালিয়েছেন।[২]

এরূপ একটি উদাহরণ হলো من عرف نفسه فقد عرف ربه– এ হাদিসটি যার অর্থ হলো : ‘যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, নিশ্চয় সে তার প্রভুকে (প্রকৃত প্রভু আল্লাহকে) চিনতে পেরেছে’। এখন প্রশ্ন হলো এ হাদিসের বিষয়বস্তু কি কোরআন সমর্থন করে? যদিও কোরআনে সরাসরি এরূপে কিছু বর্ণিত হয় নি, কিন্তু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যৌক্তিকভাবে এই বাক্যটি (উক্তিটি)-কে পরিবর্তনের (Obversion) মাধ্যমে এমন একটি বাক্য পায় যা ‘তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে ফলে তিনিও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন’[৩] (نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَىٰ هُمْ أَنْفُسَهُمْ) এবং ‘তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন’[৪] (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ)– আয়াত দু’টির অনুরূপ। এ দৃষ্টিতে এ দু’টি আয়াতকে হাদিসটির বিষয়বস্তুর সমর্থক গণ্য করা যেতে পারে এবং এভাবে হাদিসটিকে সত্যায়ন করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো এতদর্থে বুদ্ধিবৃত্তির প্রামাণ্যতার বিষয়টি শিয়া-সুন্নি উভয় মাযহাবের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য।

---

১. Reciprocal hindrance proof.

২. বিস্তারিত জানতে দেখুন : জাওয়াদী আমুলী, আবদুল্লাহ্, তাসনীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯-১২৩; মেসবাহ, মুহাম্মাদ তাকী, মায়ারেফে কুরআন, পৃ. ৬৮-৭৮।

৩. সূরা হাশর : ১৯।

৪. সূরা তাওবা : ৬৭।

কোরআনের তাত্ত্বিক উক্তি ও বর্ণনাসমূহের মর্মোদ্ধার

আমরা ‘কোরআনের ব্যাখ্যার সম্ভাব্যতা[১] এবং তার বৈধতা’ শিরোনামে শিয়া-সুন্নি উভয় মাযহাবের দৃষ্টিতে কোরআনের তাফসীরের বৈধতার বিষয়টি আলোচনা করেছি। সেখানে বলা হয়েছে যে, তাফসীরের ক্ষেত্রে আয়াতের মর্মার্থ উদ্ঘাটনের বিষয়টি বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা ও বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী। তাছাড়া যেহেতু উভয় মাযহাবের দৃষ্টিতে তাফসীর ও ব্যাখ্যা একটি বৈধ বিষয়, সেহেতু কোরআনের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো (স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলোর বিপরীতে) বুঝতে আক্‌লের প্রামাণ্যতার বিষয়টি সকলের নিকট একটি গ্রহণযোগ্য বিষয়। তাই বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোরআনের মর্মার্থ উদ্ধারের জন্য অভিধান, অন্য আয়াতসমূহ, হাদিসসমূহ, অভ্যন্তরীণ ও সংযুক্ত (আয়াত সংশিষ্ট) দলিল এবং পারিপার্শ্বিক ও বহির্গত ইঙ্গিতসমূহের সাহায্য নেওয়া একটি স্বীকৃত বিষয় এবং আয়াতসমূহের অস্পষ্টতা দূরীকরণের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য পথ। কারণ, বাহ্যিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তির এরূপ প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল বিশেষ আয়াতে আল্লাহর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা সম্ভব। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যে সকল উৎসকে বুদ্ধিবৃত্তি কাজে লাগাবে সেগুলো যৌক্তিক ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে এবং সেই সাথে বিশেষ আয়াতের জন্য তা প্রমাণ হিসেবে গণ্য হওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই ন্যায় অনুমানের (Syllogism) ক্ষেত্রে যা প্রধান ও অপ্রধান পদ বা প্রতিজ্ঞা (Premise বা Premiss) হিসেবে ব্যবহৃত হবে অবশ্যই তা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ অথবা পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ অপরিবর্তনীয় ও ধ্রুব সিদ্ধান্ত হতে হবে। এ কারণেই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিদ্যমান ধারণা ও কল্পনা (Hypotheise)− যা প্রমাণিত হয় নি অথবা যার সপক্ষে স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই তা বুদ্ধিবৃত্তির জন্য উপাত্ত (Data) বলে গণ্য হতে পারে না। এ অর্থে বুদ্ধিবৃত্তির প্রামাণ্যতার (ব্যবহৃত হওয়ার বৈধতা) বিষয়টিতে শিয়া ও সুন্নি মাযহাবের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। অবশ্য এ দুই মাযহাবের মনীষীদের মধ্যে যাঁরা তাফসীরের বৈধতার বিষয়টিতে শুধু হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ওপর নির্ভর করেন তাঁরা এ বিষয়টিকে মানেন না। যেমন শিয়াদের মধ্যে আখবারিগণ এবং সুন্নিদের মধ্যে আহলে হাদিস, যার আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি।

---

[১] Posibility.

উপরিউক্ত তিন অর্থে আক্ল বা বুদ্ধিবৃত্তির প্রামাণ্যতার সপক্ষে দলিল হলো পবিত্র কোরআন তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য বাহ্যিকভাবে আরবি ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং তার বক্তব্যকে বোঝানোর জন্য বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত নীতিকে অনুসরণ করেছে।

তাত্ত্বিক যুক্তির মাধ্যম এবং বাহ্যিক অর্থকে ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার ক্ষমতা অর্থে বুদ্ধিবৃত্তি

কখনও কখনও বুদ্ধিবৃত্তি বলতে তাত্ত্বিক যুক্তিকে (স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির বিপরীত অর্থে) বোঝার ক্ষমতা অর্থ করা হয়। কারণ, তাত্ত্বিক যুক্তিকে বুঝতে বিশ্লেষণ ও প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে যা আশ্রয় বাক্যসমূহের (Premises) বিন্যাসের মাধ্যমে অর্জিত হয়।[১] যদি আশ্রয় বাক্যসমূহ অনিশ্চিত ধারণার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয় তবে তা আল্লাহর উদ্দেশ্য বোঝার জন্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু যদি সিদ্ধান্তটি কয়েকটি অকাট্য আশ্রয় বাক্যের (স্বতঃসিদ্ধ অথবা যা থেকে স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়) ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তবে তা অকাট্য যুক্তিতে পরিণত হবে এবং তা আল্লাহর বাণীকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য প্রামাণ্য বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে যেহেতু গৃহীত সিদ্ধান্তটি অকাট্য বলে গণ্য সেহেতু কোরআনের যে সকল আয়াত এবং রাসূল (সা.) ও ইমামদের থেকে বর্ণিত যে সকল হাদিস এ সিদ্ধান্তের বিরোধী হবে তাকে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ সূরা ফাজরের এ আয়াতটি, যেখানে বলা হয়েছে– وَ جَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفّاً صَفّاً অর্থাৎ ‘এবং তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন, এমতাবস্থায় যে, ফেরেশতারা সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকবে’– এ আয়াতে আগমনের বিষয়টি অর্থাৎ جاء বা مجیء কে প্রভুর (আল্লাহর) ওপর আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু যেহেতু আমাদের নিকট বুদ্ধিবৃত্তিক অকাট্য যুক্তি[২] রয়েছে যে, পূর্ণতম অস্তিত্ব আল্লাহর ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তন, আসা-

---

[১] দ্রষ্টব্য : মুজাফফার, মুহাম্মাদ রেজা, আল মানতেক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১।

[২] কোন কোন বিশেষজ্ঞের মত হলো এক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি শুধু বাহ্যিক অর্থ থেকে বিশেষ অর্থে গ্রহণের জন্য (অর্থ) নির্দেশক প্রমাণ হিসেবে কাজ করে, বিশেষ অর্থকে নির্দিষ্টকারী কোন কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে না অর্থাৎ শব্দটি সাধারণত যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সে অর্থের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ও ভিন্ন অর্থে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। তাই বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি এক্ষেত্রে শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করাতে কোন ভূমিকা রাখে না। এ জন্য বক্তার উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করতে সাহায্যকারী প্রমাণ

যাওয়া প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যাবলি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অসম্ভব একটি বিষয় (কারণ, অপূর্ণ অস্তিত্ব তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য স্থান পরিবর্তন, অঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদির মুখাপেক্ষী। কিন্তু স্থান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টিকর্তা এগুলোর মুখাপেক্ষী হতে পারেন না এ জন্য যে, তিনি নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব)।[১] তাই আয়াতটির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক অকাট্য যুক্তি সহযোগী ও ব্যাখ্যাকারী দলিল হিসেবে প্রযোজ্য হবে যার পরিণতিতে আরোপিত বৈশিষ্ট্যটিকে (আগমন) পারিভাষিক অর্থে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে রূপক অর্থে ধরে নিতে হবে। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতেই[২] এই নীতি প্রযোজ্য।

এ (বাহ্যিক অর্থকে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির কারণে ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দানের উপকরণ) অর্থে বুদ্ধিবৃত্তি (আক্ল) ধর্মের অন্যতম উৎসের (মাধ্যম বা শুধু বাস্তবের প্রকাশকারী ও সত্য উদ্ঘাটনকারীর ভূমিকা নয়) ভূমিকা পালন করে। শিয়াদের দৃষ্টিতে এ অর্থে আকলের প্রামাণ্যতা রয়েছে এবং কোরআনের বাহ্যিক অর্থকে ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার বিষয়টিকে এই বুদ্ধিবৃত্তিই সম্ভবপর করে তোলে। অবশ্য যেমনটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, এই তাত্ত্বিক অনুধাবন আক্লের অকাট্য যুক্তির ওপর ভিত্তি করে হতে হবে, বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা অথবা অপ্রমাণিত ও অনিশ্চিত আশ্রয় বাক্যের ওপর ভিত্তি করে গঠিত ন্যায়ানুমান (Syllogism) থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত হলে চলবে না। শিয়া সূত্রে বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদিসে কোরআনের বেশ কিছু আয়াত বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির ভিত্তিতে বাহ্যিক অর্থের বিপরীতে ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৩]

এই হাদিসসমূহ শিয়ারা যে আহলে বাইত থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ উপস্থাপনের বিষয়টি শিক্ষা লাভ করেছে তার প্রমাণ বহন করে এবং সেই সাথে যারা দাবি করে যে, শিয়ারা এ ক্ষেত্রে মুতাজিলাদের অনুসরণ করেছে তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান

উপস্থাপনের প্রয়োজন। দ্রষ্টব্য : লেখকমণ্ডলী, মাহমুদ রাজাবীর তত্ত্বাবধানে রচিত, রাভেশ শেনাসিয়ে তাফসীর, পৃ. ১৯০।

[১] হিল্লী, হাসান, নাহজুল মুসতারশিদীন, পৃ. ৫১; খাজা তুসী, নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ, তাজরীদুল ইতিকাদাত, পৃ. ২২৭।

[২] উদাহরণস্বরূপ : আনআম : ৩, যুখরুফ : ৫৫, ত্বাহা : ৫।

[৩] দ্রষ্টব্য : হুয়াইজী, আলী, নুরুস সাকালাইন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৪, হাদিস ২০; সাদুক, মুহাম্মাদ কিতাবুত তাওহীদ, পৃ. ১৩২-১৩৩ (বাবুল কুদরাত) হাদিস ১৫, পৃ. ১৬২ এবং (২৬তম অধ্যায়) হাদিস ১ ও ২; মাজলিসী, মুহাম্মাদ বাকির, বিহারুল আনওয়ার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮ ও ৩৩৪, হাদিস ৪৫ এবং ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪, হাদিস ৬, পৃ. ৫, হাদিস ৮, পৃ. ৬৪, হাদিস ৫ ইত্যাদি।

করে। এ বিষয়ক আরো কিছু উদাহরণ আমরা শীঘ্রই ‘তাফসীরের ক্ষেত্রে আক্‌লের ব্যবহার’ শীর্ষক আলোচনায় মহান আল্লাহকে দর্শনের ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করব।

সুতরাং শিয়ারা নবী ও রাসূলদের প্রতি প্রেরিত ওহী যা (নবীদের ন্যায় অন্যতম) বাহ্যিক ঐশী দলিল ও প্রমাণ বলে গণ্য তার বিপরীতে বুদ্ধিবৃত্তিকে অভ্যন্তরীণ দলিল বলে মনে করে এবং এটাকে তাফসীরের অন্যতম উৎস জ্ঞান করে।[১] শিয়া মুফাস্‌সিরগণ বিশ্বাস করেন, পবিত্র কোরআন বুদ্ধিবৃত্তির প্রামাণ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে অস্বীকার করে নি, এমনকি কোরআনের অকাট্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টিও বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। এ কারণেই তারা তাফসীরের উৎসসমূহ ও মাধ্যমের উল্লেখ করতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে আক্‌লের বিষয়টিকে এনেছেন এবং তাকে ‘সঠিক সহজাত মানব প্রবৃত্তি’ (ফিতরাত) এর অনুবর্তী হওয়ার শর্তে গ্রহণ করেছেন।[২] এ শর্ত আরোপের কারণ হলো যে, আক্‌ল কখনও কখনও কল্পনা, ভালোবাসা, ক্রোধ ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত দেয়। ফলে তার উপস্থাপিত যুক্তি অপযুক্তিতে পর্যবসিত হয়। এক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আয়াতুল্লাহ জাওয়াদী আমুলীর মত নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণিত হয়েছে :

‘আক্‌ল তখনই আল্লাহ প্রদত্ত অভ্যন্তরীণ নবী বলে গণ্য হবে যখন সে সত্যবাণী বহনকারী হবে এবং যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সঠিক যুক্তির শর্তসমূহ পূরণ করবে, কিন্তু কখনও কখনও সে মিথ্যাবাদী হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাই যখন সে অপযুক্তি প্রদর্শন করে তখন সে নবী হওয়ার মিথ্যা দাবিদার এবং এ ক্ষেত্রে সে ঐশী বাণীর কোন অংশেরই অধিকারী নয়।’[৩]

তিনি অন্যত্র বলেছেন :

‘যুক্তিনির্ভর বুদ্ধিবৃত্তি (برهان عقلی) হলো তা-ই যা কল্পনার মন্দ প্রভাব (সত্যের বিপরীত চিত্র ধারণ) এবং ভ্রমাত্মক ধারণা ও মত (ভালোবাসা, বিদ্বেষ ও বিশেষ প্রবণতার বশবর্তী হয়ে কোন কিছুর ভিন্নরূপ অর্থ গ্রহণ) হতে মুক্ত এবং এর মাধ্যমেই (এর মৌলনীতির ওপর ভিত্তি করেই) মানুষ নিজের মধ্যে বিদ্যমান জ্ঞানসমূহকে

---

১. দ্রষ্টব্য : তুসী, মুহাম্মাদ, আত তিবইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬; খুয়ী, আবুল কাসেম, আল বায়ান, পৃ. ৩৯৮; তাবাতাবায়ী, মুহাম্মাদ হুসাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

২. খুয়ী, আবুল কাসেম, আল বায়ান, পৃ. ৩৯৭।

৩. জাওয়াদী আমুলী, আবদুল্লাহ্, তাসনীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭০।

ব্যবহার করে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের অপরিহার্যতা, তাঁর চিরন্তন ও চিরঞ্জীবতার বৈশিষ্ট্যসহ শ্রেষ্ঠতম অন্যান্য গুণকে প্রমাণ করে ও স্থায়িত্ব দান করে।... আক্‌ল যে সকল ক্ষেত্রে (কোরআনের আয়াতসমূহকে) বোঝার ক্ষমতা রাখে এবং যুক্তিনির্ভর বুদ্ধিবৃত্তি তা থেকে কোন বিষয়কে প্রমাণ অথবা প্রত্যাখ্যান করে তা যদি কোরআন বা হাদিসের বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী হয় সে ক্ষেত্রে যুক্তিনির্ভর বুদ্ধিবৃত্তি কোরআন ও হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রাধান্য পাবে। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তি এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী সংশ্লিষ্ট (বিচ্ছিন্ন অথবা সংযুক্ত)[১] অবিচ্ছেদ্য যৌক্তিক প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে এবং তা উপেক্ষা করে ধর্মের বাণীর অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই তা করা বৈধ বলে গণ্য হতে পারে না।'[২]

তাফসীরের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহারের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ

বুদ্ধিবৃত্তিলব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে শিয়া ও মুতাজিলাদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যা আশআরীদের থেকে স্বতন্ত্র। অবশ্য এই স্বতন্ত্রতার বিষয়ে শিয়া ও মুতাজিলাদের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে যা এখানে আমরা আলোচনা করব।

ধর্মীয় বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য অনুধাবনের ক্ষমতা ও স্বাধীনভাবে কর্মের ভালোমন্দ বোঝার মাধ্যম হিসাবে বুদ্ধিবৃত্তি

এ অর্থে বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়টি মূলত দর্শন ও কালামশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন দিক থেকে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী সংক্ষিপ্তভাবে আয়াতুল্লাহ্ মুরতাজা মুতাহহারীর 'আদলে ইলাহী' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি।

প্রথমে কর্মসমূহের সত্তাগত ভালো ও মন্দ হওয়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। এ অর্থে যে, কোন কর্ম (তার কর্তা এবং সত্তাবহির্ভূত শর্ত ও কারণ বিবেচনা ব্যতীত) সত্তাগতভাবে ভালো এবং আবশ্যকীয় অথবা মন্দ এবং পরিত্যাজ্য, নাকি কর্মসমূহের

---

[১] সংযুক্ত বা অবিচ্ছিন্ন যুক্তি বলতে যে আয়াতের তাফসীর করা হচ্ছে তার সঙ্গেই যে সকল শব্দগত ও বুদ্ধিবৃত্তিলব্ধ দলিল রয়েছে তা-ই উদ্দেশ্য। আর বিচ্ছিন্ন দলিল বলতে ঐ আয়াতকে ব্যাখ্যাকারী অন্য আয়াতসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহকে বোঝানো হয়।-অনুবাদক

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩।

ভালো-মন্দ হওয়ার বৈশিষ্ট্য আরোপিত এবং চুক্তিভিত্তিক কোন বিষয়? যেহেতু এখানে কর্মসমূহের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই এই বৈশিষ্ট্যসমূহকে উদ্ঘাটনে বুদ্ধিবৃত্তি ও তার স্বাধীনতার বিষয়টি চলে আসে। বিষয়টি এভাবে উপস্থাপিত হয় : বুদ্ধিবৃত্তি কি বস্তুসমূহের ভালো ও মন্দ হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে, নাকি এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধানের মুখাপেক্ষী?[১] (এ কারণেই ভালো ও মন্দের সত্তাগত হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে ভালো ও মন্দের বুদ্ধিবৃত্তিক বিচার বলা হয়ে থাকে)। এ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই 'যৌক্তিক অবিচ্ছিন্নতা'র নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মীয় বিধান ও বুদ্ধিবৃত্তির পারস্পরিক সমর্থন এ দু'য়ের মধ্যে যৌক্তিক অবিচ্ছিন্নতার সম্পর্ক সৃষ্টি করে অর্থাৎ যেখানেই বুদ্ধিবৃত্তি কোন কিছুকে কল্যাণ ও সত্তাগতভাবে ভালো বলে চিহ্নিত করে অথবা কোন কিছুকে সত্তাগতভাবে মন্দ ও অকল্যাণকর বলে গণ্য করে তা শরীয়তের কোন বিধান ভালো অথবা মন্দ এবং কল্যাণ বা অকল্যাণজনক হওয়ার কারণ বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইসলামের শরীয়ত (বিধানশাস্ত্র) বিশেষ কোন কল্যাণকে অর্জন অথবা বিশেষ কোন অকল্যাণকে প্রতিহত করার জন্য ঐ বিধানটি প্রণয়ন করেছে; এমনকি যদিও ঐ বিধান শরীয়তে বর্ণিত না হয় তদুপরি বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে কোন বিষয়কে ভালো বা মন্দ বলা যায়। অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি স্বতন্ত্রভাবে শরীয়তের বিধান প্রণয়নের অধিকার রাখে ও শরীয়তের অন্যতম মাধ্যম বলে গণ্য হয়। শিয়াদের মতে যদি এ অর্থে আক্‌লকে অস্বীকার করা হয় তবে নুবওয়াতের দাবির সত্যতা (ও অসত্যতা) প্রমাণ ও যাচাই করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং এ বিষয়টি ভালো-মন্দের বুদ্ধিবৃত্তিক বিচারকে (সঠিকতাকে) অস্বীকার করার অন্যতম নেতিবাচক পরিণতি।[২] কিন্তু এ অর্থে বুদ্ধিবৃত্তি আহলে সুন্নাতের সবচেয়ে বড় অংশ (আশআরিগণ) কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যের ক্ষুদ্র একটি অংশ (মুতাজিলারা) তা সমর্থন করেছে। শিয়া ও মুতাজিলাদের এরূপ বিশ্বাস তাফসীরের

---

১. আশআরিরা বিশ্বাস করেন যে, নীতিগতভাবে কোন বিষয় ভালো বা মন্দ হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের অধীন। আল্লাহ্ যে কর্মের নির্দেশ দান করেন তাই হলো ভালো এবং যে কর্ম থেকে নিষেধ করেন তাই মন্দ। সুতরাং আক্‌ল শরীয়তের (ধর্মীয় বিধান) নির্দেশনা ব্যতীত স্বাধীনভাবে বস্তু ও কর্মসমূহের ভালো ও মন্দকে অনুধাবন করতে পারে না। দ্রষ্টব্য : রাজী, ফাখরুদ্দীন, আল মাহসুল ফি ইলমিল ফিক্‌হ, পৃ. ২৪; হিল্লী, হাসান, কাশফুল মুরাদ ফি শারহি তাজরীদিল ইতিকাদ, পৃ. ৩০২; হিল্লী, হাসান, আর রিসালাতুস সা'দিয়া, পৃ. ৫৩-৫৯।

২. বিস্তারিত জানতে দেখুন : খুয়ী, আবুল কাসেম, আল বায়ান, পৃ. ৩৬-৩৭।

ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, মুতাজিলাদের মতে এ অর্থে বুদ্ধিবৃত্তি শাফায়াতের (বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি অথবা বেহেশতে অতিরিক্ত মর্যাদা লাভ) ক্ষেত্র ও পরিধি নির্ধারণ করে। মুতাজিলারা কিছুসংখ্যক ব্যক্তির জন্য শাফায়াতের বিষয়টি–যা কিয়ামতের দিন রাসূল (সা.)-এর উম্মতের জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বলে বিবেচিত ইসলামের অনস্বীকার্য একটি নীতি–এ জন্য অস্বীকার করে যে, মহান আল্লাহ্ কর্তৃক অপরাধীদের (পাপী ও গুনাহগার) শাস্তিদানের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি পালন না করা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে একটি মন্দ বিষয় বলে গণ্য। আর তাই তারা বলে : 'মহান আল্লাহ্ বড় গুনাহ্য় পতিত ব্যক্তিকে শাস্তিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাই তিনি যদি তাকে শাস্তি না দেন তবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হবেন এবং এ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী গণ্য হবেন। কিন্তু যেহেতু এ দু'টি বিষয়ই অসম্ভব এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম; সুতরাং কবীরা গুনাহকারী (মহাপাপী) ব্যক্তি শাফায়াতের (ঐশী ব্যক্তিদের সুপারিশের) অন্তর্ভুক্ত হবে না।'[১] আলোচ্য অর্থে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহারের এটি অন্যতম ক্ষেত্র। যদিও শিয়াদের মতে সৎকর্মের জন্য পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মন্দ কর্ম বলে গণ্য, কিন্তু কাউকে (তার অপরাধের কারণে) শাস্তিদানের প্রতিশ্রুতি পালন না করা সকল সময় মন্দ নয়; বরং বিশেষ পরিস্থিতিতে এরূপ (অপরাধী) ব্যক্তিকে ক্ষমা করা ভালো ও পছন্দনীয় কর্ম বলে বিবেচিত।

যদি আলোচনার বিষয়টিকে বৃহত্তর পরিসরে উপস্থাপন করি তাহলে এরূপ বলা যেতে পারে :

যদিও এ আলোচনাটি কর্মসমূহের সত্তাগত ভালো-মন্দ (বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীন ভালো-মন্দ বিচার ক্ষমতা) সম্পর্কিত, যার মূল কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের বাধ্যতা ও স্বাধীনতার এবং 'আল্লাহর ন্যায়বিচারে'র মধ্যে নিহিত [কারণ, শুধু কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতার বিষয়টি স্বীকার করলে তার কর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির ন্যায়সঙ্গত অর্থ করা যায়, যদি মানুষ কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন না হয় এবং ঐশী ইচ্ছা অথবা পরিবেশগত কারণসমূহ মানুষকে বাধ্য করে তবে সে ক্ষেত্রে তার ওপর দায়িত্ব আরোপ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে (পালন করা বা না করা) পুরস্কার ও শাস্তিদান নিরর্থক হবে], কিন্তু এ আলোচনা তাওহীদের (একত্ববাদ) আলোচনায়ও প্রবেশ করেছে এবং এভাবে প্রশ্ন

---

১. দ্রষ্টব্য : কাজী, আবদুল জাব্বার, শারহুল উসুল আল খামসা, পৃ. ১৩৫-১৩৬।

উত্থাপিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর কর্মসমূহও কি মানুষের কর্মের ন্যায় বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়? অন্যভাবে বলা যায়, স্রষ্টার কর্মও কি সৃষ্টির (মানুষের) কর্মের ন্যায় 'কেন' ও 'কী উদ্দেশ্যে' প্রশ্নের সম্মুখীন এবং তাঁর কর্মের ক্ষেত্রেও কি সবচেয়ে কল্যাণকর, সবচেয়ে উপযোগী পন্থা ইত্যাদি বিষয় কর্ম নির্ধারণে ভূমিকা রাখে? নাকি এ বিষয়গুলো শুধু মানুষের বৈশিষ্ট্য। তাই পবিত্র সত্তার সঙ্গে এরূপ বিষয়কে সম্পর্কিত করা 'সদৃশতা'র শামিল অর্থাৎ স্রষ্টাকে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনার নামান্তর যা আল্লাহর সত্তাগত একত্ববাদ, সত্তাগত অমুখাপেক্ষিতা, তিনি কোন কিছুর অনুরূপ নন, কোন কিছুর (কারণের) ফল নন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী।

এ ধরনের কালামশাস্ত্রীয় আলোচনা কোরআনের অনেক আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে−বিশেষত যে সকল আয়াতে মহান আল্লাহকে প্রজ্ঞাবান বলা হয়েছে, অথবা যে আয়াতগুলো তাঁর সত্তাগত (যেমন সর্বজ্ঞানী হওয়া, চিরঞ্জীবতা, সর্বশক্তিমান হওয়া...) ও কর্মগত (রিজিকদাতা, প্রাণদাতা, মৃত্যুদাতা..) একত্ববাদের বিষয়টি উল্লেখ করেছে এবং কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা ও বাধ্যতার বিষয় আলোচনা করেছে−ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।[১]

শিয়া মনীষীগণ যেহেতু উপরিউক্ত অর্থে বুদ্ধিবৃত্তিকে তাফসীরের ক্ষেত্রে ব্যবহারের বিষয়টি অস্বীকার করেন না সেহেতু কোরআনের আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী বলেছেন :

শিয়া চিন্তাধারায় ন্যায়বিচার, স্রষ্টার ন্যায়পরায়ণতা, বুদ্ধিবৃত্তির মর্যাদা, স্বাধীন ব্যক্তিত্ব, মানুষের কর্ম স্বাধীনতা এবং বিশ্বজগতে প্রজ্ঞাপূর্ণ শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ প্রমাণিত বলে গণ্য। অথচ এ বিষয়ক বিশ্বাস স্রষ্টার সত্তাগত ও কর্মগত একত্ববাদের বিষয় দু'টিকে ত্রুটির সম্মুখীন করে নি; বরং একত্ববাদের সকল পর্যায়কে ঠিক রেখে মানুষের স্বাধীনতার বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। শিয়া কালামশাস্ত্রে ঐশী রাজত্বে মানুষের কোনরূপ অংশীদারিত্বের ধারণা ব্যতীতই তার স্বাধীনতার বিষয় প্রমাণিত

---

[১] দ্রষ্টব্য : খুয়ী, আবুল কাসেম, আল বায়ান, ৮৮; তাবাতাবায়ী, মুহাম্মাদ হুসাইন, আল মিযান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৩-৯৬। (বাধ্যতা ও পূর্ণ স্বাধীনতার আলোচনা এবং এ সম্পর্কিত হাদিসশাস্ত্রীয় আলোচনায় তিনি পবিত্র ইমামদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা বলেছেন : 'বাধ্যতাও নয়, পূর্ণ স্বাধীনতাও নয়; বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি।' প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-১০৫।

হয়েছে (তার বিপরীতে মুতাজিলারা কর্মের ক্ষেত্রেও মানুষের স্বাধীনতার বিষয় প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের বিষয়টি ক্ষুণ্ন করেছে এবং আল্লাহর ইচ্ছাকে মানুষের ইচ্ছার অধীন বানিয়েছে)। শিয়া দৃষ্টিতে ঐশী পরিমাপ ও মীমাংসা (কাজা ও কাদার) সমগ্র অস্তিত্বজগতে বিদ্যমান। তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছা, নির্ধারণ ও মীমাংসার বিপরীতে মানুষের বাধ্যতার (যেমনটি আশআরীরা বিশ্বাস করে) সিদ্ধান্ত ছাড়াই ঐশী পরিমাপ ও মীমাংসার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন।

শিয়ারা তাওহীদের ক্ষেত্রে গুণগত একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং এ ক্ষেত্রে তারা আশআরী বিশ্বাসকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে এবং মুতাজিলাদের সমমত পোষণ করেছে, তবে এ পার্থক্যসহ যে, মুতাজিলারা তা করতে গিয়ে আল্লাহর গুণাবলিকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সত্তাকে গুণাবলির স্থলাভিষিক্ত করেছে। কিন্তু শিয়ারা সত্তা ও গুণাবলির একত্বে বিশ্বাস করে যা ঐশী জ্ঞানের গভীরতম পর্যায়। অন্যদিকে তারা কর্মগত একত্ববাদের ক্ষেত্রে আশআরীদের মতকে সমর্থন করেছে। কিন্তু আশআরীদের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে তাদের সঙ্গে পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করে নি এবং এক্ষেত্রে তাদের মতো বিশ্বে বিদ্যমান কার্য ও কারণের মধ্যে সম্পর্ককে অস্বীকার করে নি। তাই শিয়াদের একত্ববাদের (সত্তাগত, গুণ ও কর্মগত) ধারণা এমন পূর্ণতার অধিকারী যার নজির পূর্বে কখনও ছিল না।...

শিয়া দার্শনিকদের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার এমন একটি বাস্তবতা যাকে ব্যাখ্যা করলে কখনই মহান পবিত্র সত্তা (আল্লাহ) বাধ্য বলে গণ্য হন না এবং এমন কোন নিয়মের অধীন হয়ে পড়েন না যার পরিণতিতে তাঁর সার্বভৌম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বিন্দু মাত্র ক্ষুণ্ন হবে...। অনুগ্রহ ও উদ্দেশ্যের বিষয়টিও কর্তাগত লক্ষ্য ও কর্মগত লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য ও বিভক্তির মাধ্যমে সমাধান হয় এভাবে যে, মহান আল্লাহর কর্মের প্রজ্ঞাজনিত ও কল্যাণমূলক হওয়া বস্তুসমূহের তাদের স্ব স্ব লক্ষ্যে পৌঁছার সমার্থক। দার্শনিকদের দৃষ্টিতে প্রত্যেক কর্মেরই লক্ষ্য রয়েছে এবং মহান পবিত্র সত্তা হলেন সকল লক্ষ্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ লক্ষ্যসমূহের লক্ষ্য (غاية الغايات)। সকল কিছুই তাঁর থেকে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে [যেমনটি পবিত্র কোরআন বলেছে :]

و أنّ إلى ربّک منتهى ‘এবং নিশ্চয় (সকল কর্মের) পরিসমাপ্তি শুধু তোমার প্রতিপালকের দিকেই।’[১]

‘আদলে ইলাহী’ গ্রন্থের ২য় সংস্করণের ভূমিকায় শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মুতাহ্হারী যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন তা থেকেও এ বিষয়ে আহলে সুন্নাতের আশআরী ও মুতাজিলা বিশ্বাসের সাথে শিয়া বিশ্বাসের পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলো–যার মূল পবিত্র ইমামগণের বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে নিহিত–সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

সেই সাথে যারা অজ্ঞতাবশত এ দাবি করে যে, শিয়ারা বুদ্ধিবৃত্তির ভালো-মন্দ বিচার ক্ষমতার ধারণা এবং মহান আল্লাহর কর্ম প্রজ্ঞাপূর্ণ হওয়া সম্পর্কিত মত মুতাজিলাদের থেকে গ্রহণ করেছে এবং তাদের অনুসরণে কালামশাস্ত্রে এ বিষয়টি এনেছে ও তা প্রমাণের জন্য কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় এ আলোচনাটি উপস্থাপন করেছে[২]– তাদের এ বক্তব্যের অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়।

---

[১] সূরা নাজম : ৪২।
মুতাহ্হারী, মুর্তাজা, আদলে ইলাহী, পৃ. ২১-২২; শহীদ মুতাহ্হারী এই বিষয়টি উপস্থাপনের পর লিখেছেন : অবশ্য উপরোল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। তিনি তাঁর ‘সেইরি দার নাহজুল বালাগাহ’ গ্রন্থে এবং ‘উসূলে ফালসাফা ওয়া রাভেশে রিয়ালিজম’ গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে এবং ‘ইনসান ওয়া সারনেভেস্ত’ গ্রন্থে উক্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন।

[২] উদাহরণস্বরূপ : জাহাবী, মুহাম্মাদ হুসাইন, আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫ ও ২৮; আশআরী, আবুল হাসান, মাকালাতুল ইসলামীয়ীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫; আহমাদ আমিন, দ্বোহাল ইসলাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮, এডাম মিথ্জ, তামাদ্দুনে ইসলামী দার কারনে চহোরম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮; আবদুল জাব্বার হামেদানী, আল মানিয়াতু ওয়াল আমাল, পৃ. ৯৬।
তাদের এরূপ দাবির অসারতা সম্পর্কে জানতে দেখুন : হাসানী, হাশেম মারফু, আশশিয়া বাইনাল আশাইরাহ ওয়াল মুতাজিলাহ; কোন কোন গবেষক পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রমাণসহ এ বিষয়টি প্রমাণ করেছেন যে, মুতাজিলারা উপযুক্ত বিষয়গুলোতে শিয়া চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য : জাওয়াদী, কাসেম, মুতাজিলাদের ওপর শিয়া কালামশাস্ত্রের চিন্তাগত প্রভাব, মাজালেয়ে হাফত আসমান, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৮ ফারসি সাল, পৃ. ১২২-১৪৯; তিনি এ বিষয়ের ঐতিহাসিক ধাপের উল্লেখ করে বলেছেন : ‘শিয়াদের বিরোধী গোষ্ঠী যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন তা হলো উপরিউক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে পবিত্র ইমামগণের বাণীতে যা উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের বাণীসমূহে উত্থাপিত অসংখ্য দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রীয় আলোচনায় উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁদের যে দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত হয়েছে [বিশেষত ইমাম আলী (আ.), ইমাম সাজ্জাদ (আ.) (সাহিফায়ে সাজ্জাদিয়া গ্রন্থে), ইমাম সাদিক (আ.) এবং ইমাম রেযা (আ.) এর বাণীসমূহে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়) তা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। উক্ত বাণীসমূহের ভিত্তিতেই শিয়া কালামশাস্ত্রের কাঠামো রচিত হয়েছে যা শিয়া কালামশাস্ত্রের মৌলিকতাকে প্রমাণ করে...।’ অতঃপর লেখক যে সকল ক্ষেত্রে শিয়া ও মুতাজিলারা

বুদ্ধিবৃত্তির অনুধাবন ক্ষমতার সীমা

পরিশেষে যে বিষয়টির উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি তা হলো বুদ্ধিবৃত্তির অপর একটি ব্যবহার রয়েছে যার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। শিয়াদের দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তি কোরআনের তাফসীরের সাথে সম্পর্কিত হাদিসসমূহের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা যাচাই করতে পারে। তাই যদি কোন তাফসীর সংক্রান্ত হাদিস যৌক্তিক বুদ্ধিবৃত্তির (عقل برهانی) বিরোধী হয় এবং তাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা না যায় তবে তা প্রত্যাখ্যাত। অবশ্য শিয়ারা এ বিশ্বাস রাখে যে, যা কিছুই মহানবীর পবিত্র আহলে বাইতের ইমামদের থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে তা কখনই যৌক্তিক বুদ্ধিবৃত্তির পরিপন্থী হতে পারে না। কারণ, যা কিছুই পবিত্র ইমামদের থেকে বর্ণিত হয়েছে তা অবশ্যই সত্য এবং তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই (যদিও কোন কোন

চিন্তাগতভাবে পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছে তার তালিকা পেশ করেছেন এবং শেখ মুফিদের ‘আওয়ায়েলুল মাকালাত’ গ্রন্থ থেকে কালামশাস্ত্রে শিয়া ও মুতাজিলাদের মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাসগত যে পার্থক্যসমূহ রয়েছে তা তুলে ধরেছেন। অবশেষে তিনি এভাবে উপসংহার টেনেছেন যে, যদি শিয়ারা তাদের চিন্তাধারাকে মুতাজিলাদের থেকে গ্রহণ করে থাকে তবে তাদের মধ্যে এত মতপার্থক্য কেন থাকবে? তদুপরি মুতাজিলাদের সঙ্গে শিয়াদের বিতর্কের যে সকল ঘটনা শিয়া গ্রন্থসমূহে (যেমন : নাজ্জাশীর ‘রেজাল’ গ্রন্থ এবং ইবনে নাদিমের ‘ফেহেরেসত’ গ্রন্থ) বর্ণিত হয়েছে এবং মুতাজিলারা শিয়াদের মত খণ্ডন করে যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন (যার তালিকা ইবনে নাদিম তাঁর ‘ফেহেরেসত’ গ্রন্থে এনেছেন) তা এ দুই মতের অনুসারীদের পরস্পরের বিপরীত অবস্থানকেই প্রমাণ করে যা তাদের মতদ্বৈততা থেকে উৎসারিত। অতঃপর লেখক তাঁর প্রবন্ধে মুতাজিলারা যে শিয়াদের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণভাবে অনেক কিছু গ্রহণ করেছে তা প্রমাণ করেছেন। মহানবী (সা.) ও পবিত্র ইমামদের বাণীসমূহ কোরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং ওহীর সাথে সম্পর্কিত তাই তাঁদের বক্তব্যসমূহ যৌক্তিক বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সংগতিশীল। অবশ্য এ কথার অর্থ এটা নয় যে, সকলেই তাঁদের সকল বাণীকে বুঝতে সক্ষম। এ কারণে যখন কোন হাদিসের বিষয়বস্তু বুদ্ধিবৃত্তির অনুধাবন ক্ষমতার মধ্যে না থাকবে তখন তাকে সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান অথবা অস্বীকার করা যাবে না (তবে যদি এমন হয় যে, বিষয়টি বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব, সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা); বরং এরূপ অবস্থায় সহজাত বুদ্ধিবৃত্তির দায়িত্ব হলো স্বীয় উপলব্ধির সীমাকে নির্ধারণ করা। কেননা, বুদ্ধিবৃত্তি যেহেতু তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত সেহেতু ঐ বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান না করে এক্ষেত্রে তার অক্ষমতাকে প্রকাশ করে। সুতরাং সুষ্ঠু বুদ্ধিবৃত্তি এরূপ ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত দেয় যে, বিষয়টি অসম্ভব বলার (বা হওয়ার) কোন যুক্তি সে দেখে না। (উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : তাবাতাবায়ী, মুহাম্মাদ হুসাইন, আল মিজান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২, ২৯০, ২৯৩; ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বেশ কিছু হাদিস বর্ণনা করে বলেছেন : ‘বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিষয়টি অসম্ভব হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।’)

মুফাসসির, যেমন- কাতাদা, আকরামা ও অন্যদের থেকে এমন কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে যাতে যৌক্তিক বুদ্ধিবৃত্তির বিপরীত বিষয় লক্ষণীয়।[১]

সারসংক্ষেপ

বুদ্ধিবৃত্তি অনুধাবনের মাধ্যম হিসেবে ওহীর ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাফসীরের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির প্রামাণ্যতার বিষয়টি ইসলামি বিভিন্ন দল ও মতের মধ্যে (বিচ্ছিন্ন কিছু দল ব্যতীত) প্রসিদ্ধদের (শিয়া, আশআরী ও মুতাজিলা) কারো নিকটই সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হয় নি। ইজতিহাদী তাফসীর (হাদিসনির্ভর তাফসীরের বিপরীতে) গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে (বিশেষত কোরআনের বিশেষ কিছু আয়াতের ক্ষেত্রে) আল্লাহর বাণী বোঝার মাধ্যম হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তির গুরুত্বের বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। শিয়া-সুন্নি উভয় মাযহাবের ইজতিহাদী ধারার মুফাস্‌সিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর উদ্দেশ্যকে বোঝানোর জন্য আয়াতসমূহের বাহ্যিক বাচনভঙ্গিতে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের মধ্যে প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতিকে ভিত্তি ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেহেতু বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন (জ্ঞানবান) মানুষেরা তাদের মনোভাবকে প্রকাশের জন্য ও শ্রোতাদের বোঝানোর জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করেন সেহেতু যে সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির অনুধাবন ক্ষমতা প্রচলিত ভাব আদান-প্রদান রীতির অধীনে থাকবে, যেমন- আরোপিত ও সম্বন্ধিত বিষয় রূপক ও প্রতীকী ইঙ্গিতসমূহ উদ্ঘাটনের মাধ্যমে স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে অনুধাবন, যৌক্তিক ন্যায়অনুমান গঠন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কসমূহকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছা এবং তাত্ত্বিক যুক্তিবাক্য (Proposition)-কে প্রমাণের জন্য উপাত্তসমূহের যৌক্তিক বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক অনুধাবন প্রামাণ্য বলে গণ্য। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শিয়াদের মধ্যে বিদ্যমান 'আখবারী' (যারা তাফসীরের ক্ষেত্রে শুধু হাদিসের বাণীর ওপর নির্ভর করে) গোষ্ঠী এবং আহলে সুন্নাতের মধ্যকার 'আহলে হাদিস'

---

[১] দ্রষ্টব্য : তাবাতাবায়ী, মুহাম্মাদ হুসাইন, আল মিজান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫; তিনি অন্যত্র আহলে সুন্নাতের সূত্রে বর্ণিত তিনটি হাদিস যাতে আল্লাহকে সৃষ্টির অনুরূপ বলা হয়েছে (দৈহিক রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে) তার সমালোচনা করে বলেন : 'এই হাদিসসমূহ আল্লাহ্ সম্পর্কে যা বলেছে তা তাঁকে সৃষ্টির সদৃশ ভাবার অলীক ধারণাপ্রসূত এবং তা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণসমূহ এবং মহান আল্লাহর বাণীর (কোনকিছুই তাঁর সদৃশ নয়) স্পষ্ট পরিপন্থী। তাই প্রত্যাখ্যানযোগ্য অথবা তাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।– মিজান, ১৯ তম খণ্ড, পৃ. ৩৯০।

সম্প্রদায় ভিন্নমত পোষণ করে। তারা উক্ত ক্ষেত্রসমূহে বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রামাণ্য মনে করে না।

কোরআনের আয়াতসমূহের বাহ্যিক অর্থকে বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার বিষয়টি আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্যকে বোঝার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য। তাই কখনও কখনও আয়াতে বিদ্যমান শব্দের প্রচলিত অর্থকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা হয়। আয়াতকে যৌক্তিক কারণে বাহ্যিক অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি শিয়া ও মুতাজিলা তাফসীর গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এর বিপরীতে আশআরী তাফসীর ও কালামশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে বুদ্ধিবৃত্তির এরূপ ভূমিকা অস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। তাই বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে আয়াতসমূহকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি অনস্বীকার্য একটি বিষয়। সুতরাং এক্ষেত্রে শিয়া ও মুতাজিলাদের সঙ্গে আশআরীদের পার্থক্যের বিষয়টি শুধু বুদ্ধিবৃত্তির এরূপ ব্যবহারের ব্যাপকতা নিয়ে। এ পার্থক্যটি 'কিয়ামত দিবসে চাক্ষুসভাবে আল্লাহকে দেখা'র বিষয় সম্পর্কিত আলোচনায় স্পষ্ট হয়। কর্মসমূহের ভালো-মন্দ অনুধাবনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীন ক্ষমতা এবং এর ভিত্তিতে বিধি-বিধান প্রণয়ন ও উদ্ঘাটনে আক্লের স্বনির্ভরতার বিষয়টি শিয়া ও মুতাজিলা মতের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তা এই দুই সম্প্রদায়ের তাফসীর গ্রন্থসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য। কারো কারো ধারণায় বুদ্ধিবৃত্তিকে এ অর্থে প্রয়োগের বিষয়টি শিয়ারা মুতাজিলাদের থেকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাদের এ ধারণা শুধু ভুলই নয়; বরং মুতাজিলারা এক্ষেত্রে শিয়া চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এর প্রমাণ হলো মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইত থেকে এ বিষয়ে বর্ণিত অসংখ্য হাদিস এবং শিয়া মনীষীদের রচিত গ্রন্থসমূহ যাতে তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তির এরূপ প্রয়োগের বিষয়টিকে আহলে বাইতের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন (মুতাজিলাদের সাথে সম্পৃক্ত ও মিশ্রিত করেন নি)।

বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহারের অপর একটি ক্ষেত্র হলো তাফসীর সংক্রান্ত হাদিসকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিজের সীমাবদ্ধতাকে অনুধাবন। এ বিষয়ে যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তি স্বীয় ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে অবগত সেহেতু যে সকল হাদিসের ক্ষেত্রে সে অসম্ভব হওয়ার কোন যুক্তি না পায় সেক্ষেত্রে হাদিসটির বিষয়বস্তুকে খণ্ডন বা প্রত্যাখ্যান না করে 'আমি জানি না' বা 'আমি অনুধাবনে সক্ষম নই' এরূপ সিদ্ধান্ত দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিকে এ অর্থে ব্যবহার ও প্রয়োগের বিষয়টি একান্তভাবে শিয়া চিন্তাধারা ও মতের জন্য নির্দিষ্ট।

অনুবাদ : আনোয়ারুল কবীর

মহানবী (সা.)-এর ‘আহলে বাইত’ এর পরিচয়

ড. ফাতহুল্লাহ নাজ্জারযাদেগান

কিছুসংখ্যক মনীষী ‘আহলে বাইত’ পরিভাষাটিকে সার্বিকভাবে সবদিক থেকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন যা এই পরিভাষাটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দান করার দায়িত্ব থেকে আমাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছে : ‘আহল’ শব্দটি অভিধানে উপযুক্ত, যোগ্য[১] এবং ‘সামর্থ্যের অধিকারী’[২] অর্থে এসেছে এবং সাধারণভাবে এ অর্থেই প্রচলিত ও ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু যখন এ শব্দটি কোন কিছুর (বস্তু বা ব্যক্তির) সঙ্গে যুক্ত হয়–সাধারণত শব্দটি যুক্তভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে–তখন যে শব্দটির সাথে সংযুক্ত হয় সেই অনুসারে ভিন্ন অর্থ দিয়ে থাকে। ‘আহলে বাইত’ শব্দটিকে কেউ কেউ ‘গৃহের অধিবাসী’ অর্থ করেছেন।[৩] ফাইয়ুমী ‘আল আহল’ শব্দটি অর্থ করার পর ‘আহলে বাইত’-এর শাব্দিক অর্থ আত্মীয় ও নিকটজন বলেছেন।[৪] রাবেগ ইসফাহানীও ‘আহলে বাইত’ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যক্তির সঙ্গে রক্তসম্পর্কীয় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বলেছেন।[৫]

সুতরাং বলা যায় ‘আহলে বাইত’ শব্দটি অভিধানে কোনো ব্যক্তির গৃহের অধিবাসী ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তবে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে নির্দেশ করতেও এ শব্দটি প্রচলিত আছে।

কিন্তু মহানবী (সা.)-এর গৃহে যেহেতু ওহী অবতীর্ণ হতো এবং তাঁর গৃহ নবুওয়াতের গৃহ বলে প্রসিদ্ধ সেহেতু ‘আহলে বাইত’ শব্দটি তাঁর ক্ষেত্রে দুই অর্থে ব্যবহৃত

---

১. দ্রষ্টব্যঃ ইবরাহিম, আনিস, আল মো’জামুল ওয়াসিত, পৃ. ৩১।

২. ইবনে সাইয়েদা, আলী, আল মুহুকাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৬।

৩. ফারাহিদী, খালিল, আল আইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯; ইবনে মানসুর, মুহাম্মাদ, লিসানুল আরাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩।

৪. ফাইয়ুমী, আহমাদ, আল মিসবাহুল মুনীর, পৃ. ৩৩।

৫. রাবেগ, হুসাইন, মু’জামু মুফরাদাতি আলফাযিল কুরআন, পৃ. ৩৩।

হয়েছে। কখনও নবীর আহলে বাইত বলতে তাঁর অধিবাসের স্থান নির্দেশ করা হয়ে থাকে... এ ক্ষেত্রে নবীর আহলে বাইত শব্দটি কোনো বিশেষত্ব রাখে না। কারণ, অন্যদের ক্ষেত্রে শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় রাসূলের ক্ষেত্রেও সে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এ অর্থে সঠিকভাবে তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজন অথবা তাঁর পরিবারবর্গকে বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু কখনও কখনও 'ওহীর অবতরণ স্থল' ও 'নবুওয়াতের গৃহ' এ দুই বৈশিষ্ট্য সাপেক্ষে নবীর আহলে বাইত-এর অর্থ করা হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রে আহলে বাইত তাঁর পরিবারের সকল সদস্য, পরিবারবর্গ অথবা সকল আত্মীয়-স্বজন অর্থে নয়; বরং এ শব্দটি ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত ও নির্দেশ করে যাঁরা জ্ঞান, কর্ম এবং নৈতিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্যে রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতী গৃহের সদস্য হওয়ার উপযোগী ও যোগ্য...।[১]

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। সেগুলো হলো :

১. যেহেতু আহলে বাইত শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর আরোপিত হতে পারে সেহেতু আল্লাহর (যিনি চূড়ান্ত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ) পক্ষ থেকে এরূপ ব্যক্তিবর্গকে পরিচিত করাতে হবে।[২] যাঁদের ওপর এ পরিভাষাটি আরোপিত হবে তারা তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সদস্য ও (প্রথম অর্থে আহলে বাইত) হতে পারেন আবার তাঁর পরিবারের অনেক সদস্যই এ পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

২. নবুওয়াতের গৃহের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার জন্য সকল পর্যায়ের ঐশী যোগ্যতার (মানবীয় সকল বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হওয়া) প্রয়োজন এবং তা ব্যক্তির সত্তাগত ও অর্জিত বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে যাচাইয়ের মাধ্যমেই হস্তগত হয়। সর্বজনীন এ অর্থে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.)-ও আহলে বাইতের সদস্য (রাসূল সা. বলেছেন : 'সালমান আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত')[৩] গণ্য হয়েছেন।

৩. মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বাণীতে (মুখে) দ্বিতীয় অর্থে আহলে বাইত (নবী পরিবার) নবুওয়াতের গৃহের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ যোগ্যতার নমুনা ও

---

[১] বাবায়ী, আলী আকবার, মাকাতেবে তাফসীরি, পৃ. ৬৭-৬৮।

[২] যেহেতু এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন কোনটি (যেমন নৈতিক গুণাবলি) মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং কোন কোনটি এত ব্যাপক ও সূক্ষ্ম (যেমন জ্ঞানের গভীরতা) যে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি ব্যতীত কারো পক্ষে তা অনুধাবন সম্ভব নয় সেহেতু স্রষ্টা, যিনি এ সকল কিছুর ওপর পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী তিনি সকলের নিকট তাঁদেরকে পরিচিত করাবেন।–অনুবাদক

[৩] দ্রষ্টব্য: মিয্যি, ইউসুফ, তাহযীবুল কামাল, পৃ. ২৫১।

দৃষ্টান্তের অধিকারী হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি শুধু গুটি কতক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হয়েছে এবং এ শব্দটি তাঁদের জন্য পরিভাষা হিসেবে গণ্য হয়েছে অর্থাৎ তাঁদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক অর্থে এসেছে। তাই যখনই আহলে বাইত শব্দটি (যা কখনও কখনও 'ইতরাত' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যার অর্থ প্রকৃত বংশধর ও নিকটাত্মীয়) কোন হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে তা শোনামাত্রই সকলের মানসপটে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের চিত্র উদ্ভাসিত হয় (এবং মহানবীর জীবদ্দশায়ই তিনি এ অর্থে পুনঃপুন শব্দটি ব্যবহার করে সকলের নিকট এ পরিভাষাটি বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন); যেমন-হাদিসে সাকালাইন[১] (আল্লাহর কিতাব এবং আমার রক্ত সম্পর্কীয় বংশধর ও পরিবার), হাদিসে সাফিনা (আমার পরিবারের উদাহরণ হলো নূহের তরণীর ন্যায়)[২] মুবাহিলার ঘটনা এবং কিসার হাদিস (আয়াতে তাতহীরের প্রেক্ষাপটে রাসূল সা. বলেন : 'হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত), নুজুম বা তারকার হাদিস (আমার পরিবার নক্ষত্র ও তারকার ন্যায় এবং উম্মতের জন্য নিরাপত্তার স্থান) ইত্যাদি। ইনশা আল্লাহ হাদিসে সাকালাইনের আলোচনায় এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করব।

কোরআন ও আহলে বাইতের মধ্যে বিদ্যমান বিশেষ সম্পর্ক নির্দেশকারী যে হাদিসসমূহ শিয়া-সুন্নি উভয় সূত্রের নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন গ্রন্থসমূহে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে হাদিসে সাকালাইন অন্যতম। শিয়া মনীষীদের মতে এ হাদিসটি ত্রিশের অধিক সাহাবী এবং সুন্নি কোন কোন বিশেষজ্ঞদের মতে বিশের অধিক সাহাবী রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখে বিভিন্ন সময় বারবার উচ্চারিত হয়েছে।[৩] এ থেকে মনে হয় হাদিসটি মহানবী (সা.) থেকে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৪] কিন্তু এ হাদিসগুলোর মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য

---

১. মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪ ও ১৭ এবং ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৭ ও ৩৭১; আস সুনানুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭ এবং ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৪; আল মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮; কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫-১৮৮।

২. আল মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫০; কানজুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৬ এবং পৃ. ২৫০; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৬।

৩. হাইতামী, ইবনে হাজার, আস সাওয়ায়েকুল মুহরিকা, পৃ. ২২৮।

৪. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে 'হুজ্জাতুল বিদা'র 'গাদীরীয়া খুতবা'য় রাসূল (সা.) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি, যার প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব... এবং আমার আহলে বাইত।' অতঃপর 'আমি আমার আহলে বাইতের কথা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি' বাক্যটি তিনবার পুনরাবৃত্তি

নেই এবং বর্ণিত হাদিসসমূহের (মূলপাঠের) মধ্যে বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধন সম্ভব। এ ধরনের একটি হাদিস যা অসংখ্য সূত্রে শিয়া ও সুন্নি উৎসসমূহে সহীহ সনদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন : 'নিশ্চয়ই আমি দু'টি মূল্যবান ও ভারী বস্তু তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা সে দু'টিকে আঁকড়ে ধর কখনও বিভ্রান্ত হবে না, (তা হলো) আল্লাহর কিতাব ও আমার বংশধর নিকটাত্মীয় এবং তারা আমার সঙ্গে হাউজে কাউসারে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।'[১]

করলেন।– মুসলিম, সহীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৭, হাদিস ২৪০৮ এবং ইবনে হাম্বাল, আহমাদ, মুসনাদ, ৩২ তম খণ্ড, পৃ. ১০, হাদিস ১৯২৮; ইবনে শাহরে অশুব, মানাকিব, পৃ. ২২৬, হাদিস ২৮৪; আহমাদ ইবনে শুয়াইব নাসায়ী হাদিসটি 'হুজ্জাতুল বিদার গাদীরের খুতবা'য় এভাবে বর্ণনা করেছেন : 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী বস্তু রেখে গিয়েছি, তার একটি অপরটি হতে বড়, আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধর ও আহলে বাইত; এ দু'টির প্রতি কীরূপ আচরণ করবে তার প্রতি লক্ষ্য রেখ, যেহেতু এ দু'টি হাউযে কাওসারে আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।'– নাসায়ী, আহমাদ, খাসায়িস, পৃ. ১১২, হাদিস ৭৮; ইবনে মাগাযিলী, মানাকিব, পৃ. ২৩০, হাদিস ২৮৩; আবু ইয়ালী, মুসনাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭, হাদিস ১০২১; ইবনে আবি আসিম, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৬৩০, হাদিস ১৫৫৫; ইবনে হাম্বাল, মুসনাদ, ১৭ তম খণ্ড, পৃ. ২১১, হাদিস ১১১৩১; তাবরানী, সুলাইমান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৯, হাদিস ৯৮০ ও ৪৯৮১।

[১] সুন্নি সূত্রসমূহের মধ্যে দ্রষ্টব্য : তিরমিযী, মুহাম্মাদ, সুনানে তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬২২, হাদিস নং ৩৭৮৬ ও পৃ. ৬৬৩, হাদিস নং ৩৭৮৮; হাকিম নিশাবুরী, মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯ ও ১১০; ইবনে আসিম, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৬২৯, হাদিস ১৫৫৩ এবং পৃ. ৬৩০, হাদিস ১৫৫৮; ইবনে হাম্বাল, মুসনাদ, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১৬১, হাদিস ১১১০৪; তাবরানী, সুলাইমান, আল মু'জামুল কাবির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৭, হাদিস ২৬৭৮, ২৬৮০ ও ২৬৮১ এবং ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬, হাদিস ৪৯৭১; ইবনে হামিদ, মুসনাদ, পৃ. ১০৭-১০৮, হাদিস ২৪০; 'কিতাবুল্লাহ ওয়া আহলুল বাইত ফি হাদিসিস সাকালাইন মিন মাসাদিরি আহলিস সুন্নাহ' গ্রন্থে এই হাদিসটির সূত্রসমূহ মোটামুটিভাবে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিয়া সূত্রসমূহের মধ্যে দেখুন : সাদুক, মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন নি'মাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪, ২২তম অধ্যায়, হাদিস ৪৪-৬২; মাহমুদী, মুহাম্মাদ জাওয়াদ, তারতীবুল আমালী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮, হাদিস ১২১০ এবং পৃ. ১৬০-১৬২, হাদিস ১২১৩-১৩১৫ প্রভৃতি।

যায়দী মাযহাবের গ্রন্থসমূহের মধ্যে দ্রষ্টব্য : ইবনে শাজারী, আল আমালী খাসিসিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫; কুফী, মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান, মানাকিব, পৃ. ১১২, হাদিস ৬১৬ এবং পৃ. ১৩৫, হাদিস ৬৩৩, পৃ. ১৭০, হাদিস ৬৬৩, পৃ. ৩১৩, হাদিস ৭৯৯, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬, হাদিস ৯২৮-৯২৯ এবং পৃ. ৪৪৯-৪৫০, হাদিস ৯৪৮-৯৪৯। অন্যান্য যে সকল গ্রন্থে হাদিসে সাকালাইন বিভিন্ন উৎস থেকে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে আল বাহরানী, সাইয়্যেদ হাশেম, আল বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯-১৫; রাযী, শেখ হুসাইন, হাওয়ামেশুত তাহকীকাহ (আল মুরাজায়াতের সঙ্গে সংযুক্ত সূত্র বিষয়ক গবেষণার অংশ), পৃ. ৩২৭, তুশতারী কাজী নুরুলাহ্, ইহকাকুল হাক, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯-৩৭৭; হিন্দী, মীর হামিদ হুসাইন, আবাকাতুল আনওয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭-৩২৮ এবং ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০-৩৯২।

যদিও এ হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রাসূল (সা.)-এর উম্মতের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত তদুপরি দুঃখজনকভাবে আহলে সুন্নাতের গবেষকদের কাছে উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে। আমার জানামতে তাঁরা শুধু হাদিসটি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। সাধারণত মনীষী ও বিশেষজ্ঞ আলেমগণের অনুসৃত পদ্ধতি হলো যদি কোন হাদিস গুরুত্বপূর্ণ গণ্য হয় তবে তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে 'জুয' শিরোনামে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ কারণেই হাদিসশাস্ত্রের ইতিহাসে হাদিসের 'জুয' লেখা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এতদসত্ত্বেও এ হাদিসটির ক্ষেত্রে এরূপ কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি। আমাদের জানা মতে, এখন পর্যন্ত কেউই এ হাদিসটির বর্ণনার ধারা ও সূত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন নি; বরং তাঁরা হাদিসটির সনদ সহীহ্ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বালের গবেষক ও ব্যাখ্যাকারীরা চেষ্টা করেছেন যে কোন ভাবেই হোক বিশেষত যে সকল হাদিসে 'নিশ্চয়ই এ দু'টি হাউজে (কাওসারে) মিলিত হওয়া পর্যন্ত একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না' এবং 'যদি এ দু'টিকে তোমরা আঁকড়ে ধর, কখনই পথভ্রষ্ট হবে না' অংশটি বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোকে দুর্বল বলার। এক্ষেত্রে তাঁরা শুধু কয়েকটি সূত্রের প্রতি ইশারা ও উল্লেখ করে বলেছেন : যে সকল হাদিসে আহলে বাইতের অনুসরণ এবং তাঁদের কথা ও কর্মকে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে এবং উপরিউক্ত অংশ দু'টি বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো সনদের দৃষ্টিতে দুর্বল এবং সেগুলোকে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা সঠিক নয়।[১]

দুঃখজনকভাবে তাঁরা যে এ হাদিসগুলোর সনদকে দুর্বল বলেছেন তা চিন্তাপ্রসূত নয় এবং একপেশে দৃষ্টিতে দেখার ফলে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কারণ, প্রথমত, যদি তাঁরা এ ধরনের বাক্য সম্বলিত হাদিসগুলোকে শাহেদ হাদিসসমূহের (যে হাদিসের মূল পাঠে বিদ্যমান শব্দ ও ভাবার্থ অন্য হাদিসের বিষয়বস্তুকে সমর্থন করে) পাশাপাশি রেখে বিচার-বিশ্লেষণে করতেন তাহলে হাদিসে সাকালাইনকে মুতাওয়াতির পেতেন। সেক্ষেত্রে হাদিস বিশেষজ্ঞদের অনুসৃত মৌলনীতিতে বর্ণনা ধারায় উল্লিখিত বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকের বিশ্বস্ততাকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের প্রয়োজন

---

[১] দ্রষ্টব্য : শুয়াইব আল আরনুত এবং সহযোগীরা, মুসনাদে আহমাদের পাদটীকা, ১৭ তম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

অনুভব করতেন না[১] এবং হাদিসের সনদকে দুর্বল বলতেন না। দ্বিতীয়ত, তাঁরা যেভাবে এই হাদিসগুলোর সনদগুলোকে দুর্বল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন তাতে হাদিসশাস্ত্রের মৌলনীতি অনুসৃত হয় নি এবং এক্ষেত্রে তাঁদের উত্থাপিত যুক্তি প্রশ্নের সম্মুখীন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা এই হাদিসটি কয়েকজন প্রসিদ্ধ হাদিসবিশারদ (যাঁদের হাদিসের বিষয়বস্তু ও সনদের ওপর বিশেষ পাণ্ডিত্য রয়েছে), যেমন নাসায়ী, তাহাভী, ইবনে আবি আসেম, তাবরানী এবং হাকিম নিশাবুরী থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনা ধারায় ইবনে আওয়ানা আ'মাশ থেকে, তিনি হাবিব ইবনে আবি সাবিত থেকে, তিনি আবি তুফাইল থেকে, তিনি যাইদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণনা করেছেন... বর্ণনা করার পর বলেছেন : 'এই সূত্রটি বর্ণনা ধারায় (সনদের ক্ষেত্রে হাবিব ইবনে আবি সাবেত ও তাঁর পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীর মধ্যে) বিচ্ছিন্নতার কারণে দুর্বল বলে গণ্য।[২]

এই যুক্তিটি দুর্বল ও ভিত্তিহীন। কেননা, হাবিব ইবনে আবি সাবিত (মৃত্যু ১১৯ অথবা ১২২ হিজরি) আবি তুফাইলের (মৃত্যু ১০০ অথবা ১০৭ হিজরি) নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করতে পারেন না এবং সনদের (বর্ণনা ধারায়) এ অংশে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে বলে তাঁরা যে দাবি করেছেন তা সঠিক নয়। এজন্য যে, তাঁরা সমকালীন ছিলেন এবং উভয়েই কুফায় বাস করতেন। উপরন্তু রেজালবিদগণ সকলেই হাবিব ইবনে আবি সাবিতকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলেছেন, কেউ কেউ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং বিশিষ্ট হাদিস বর্ণনাকারীদের অনেকেই, যেমন আ'মাশ, সাওরী, শোবা প্রমুখ তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৩]

তদুপরি বিশিষ্ট হাদিস বিশেষজ্ঞ (হাফিজ) মিয্যী, যে সকল রাবী আবি তুফাইল থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে হাদিস শিক্ষা করেছেন তাঁদের মধ্যে হাবিব ইবনে আবি সাবিতের নামও এনেছেন।[৪] হাকিম নিশাবুরীও তাঁর 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে উপরিউক্ত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী ও মুসলিমের শর্তে

---

১. দ্রষ্টব্য : সুবহি সালেহ, উলুমুল হাদিস ওয়া মুস্তালাহাহু, পৃ. ১৫১। তিনি 'শারহুন নুখবাহ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন : 'মুতাওয়াতির হওয়ার সঙ্গে সনদ ও সূত্রের আলোচনার কোন সম্পর্ক নেই... এবং মুতাওয়াতিরের আলোচনায় হাদিসের বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার বিষয় আলোচিত হয় না; বরং বর্ণনা সূত্রের আধিক্যের কারণে তা সন্দেহাতীত গণ্য হওয়ায় তা গ্রহণ করে নেয়া বাঞ্ছনীয়।'

২. শুয়াইব আল আরনুত, প্রাগুক্ত, ১৭ তম খণ্ড, পৃ. ১৭১।

৩. মিয্যী, ইউসুফ, তাহযীবুল কামাল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮।

৪. প্রাগুক্ত।

হাদিসটি সহীহ বলে স্বীকার করেছেন।[১] হাদিস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে বুখারীর শর্ত হলো হাদিস বর্ণনাকারী ও যাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে উভয়ের সমকালীন হওয়া এবং যাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে হাদিস বর্ণনা করা হচ্ছে তাঁর থেকে শোনার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া। অপরদিকে মুসলিমের দৃষ্টিতে তখনই হাদিস সহীহ বলে গণ্য হবে যখন বর্ণনাকারী ও যাঁর থেকে বর্ণনা করা হয়েছে (مرويعنه) উভয়ে সমকালীন হবেন এবং রাবী বা বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার শর্তসাপেক্ষে যাঁর থেকে উদ্ধৃত হয়েছে তাঁর থেকে শ্রবণের সম্ভাবনা দেয়া হবে অর্থাৎ মুসলিম, রাবীর সত্যবাদিতার বিষয়টি নিশ্চিত হলেই যাঁর থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর সমকালীন হওয়ায় যেহেতু তাঁর থেকে বর্ণনার সম্ভাবনা রয়েছে সেহেতু শ্রবণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া জরুরি মনে করেন নি এবং সম্ভাবনাকেই যথেষ্ট গণ্য করেছেন।[২]

উপরিউক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী হাবিব ইবনে আবি সাবিত সকল হাদিস বিশারদের দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত। যাহাবী যিনি রিজালশাস্ত্রের (বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের জন্য যে শাস্ত্র) একজন প্রসিদ্ধ ও দক্ষ ব্যক্তিত্ব এবং সর্বজনস্বীকৃত পণ্ডিত তিনি উক্ত হাদিসটির কোন পর্যালোচনা ও সমালোচনা ছাড়াই সরাসরি বুখারী ও মুসলিমের মানদণ্ডে হাদিসটি সহীহ বলে স্বীকার করেছেন।[৩] হাদিসটির বিশুদ্ধতার সপক্ষে এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বালের ব্যাখ্যাকারগণ অন্যায়ভাবে তা উপেক্ষা করেছেন। তাঁদের চিন্তা করা উচিত ছিল যে, যদি হাবীব ইবনে আবি সাবিত, ইবনে তুফাইল থেকে উক্ত হাদিসটি শ্রবণ না করে থাকেন তদুপরি তাঁর থেকে শ্রবণের দাবি করেন এবং হাদিসটিকে তাঁর ওপর আরোপ ও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত করে থাকেন তবে তিনি বিশ্বস্ততা হারিয়েছেন। কিন্তু কোন বিশেষজ্ঞ ও রিজালবিদই তাঁকে এরূপ কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করেন নি। তাঁদের পক্ষপাতদুষ্ট বিচারের অন্যতম নমুনা হলো তাঁরা হাদিসে সাকালাইনের যে সূত্রটি 'তিরমিযী' এবং তাবরানীর

---

১. হাকিম নিশাবুরী, মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯।

২. দ্রষ্টব্য : মুসলিম, সহীহ মুসলিম বিশারহিন নাভাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭-১২৮। মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ বলেছেন : 'প্রথম যুগের আলেম ও হাদিসবিদরা এ বিষয়ে একমত যে, হাদিসে মুয়ানআন (যে হাদিসে অমুক অমুকের থেকে, তিনি অমুকের থেকে এভাবে ধারাবাহিক অমুকের থেকে অমুক বলে বর্ণিত হয়েছে তা হাদিসের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দলিল এ শর্তে যে, বর্ণনাকারী ও যার থেকে বর্ণিত তার মধ্যে সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকবে এবং বর্ণনাকারী ব্যক্তি হাদিস জাল (মিথ্যা হাদিস বর্ণনার) করার অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকবে। প্রাগুক্ত

৩. হাকিম নিশাবুরী, মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯।

'মুজামুল কাবীর' এ বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে বলেছেন : 'হাদিসটির এই সনদটিতে (সূত্র বর্ণনাধারা) যাইদ ইবনে হাসান আনমাতী থাকার কারণে দুর্বল, কারণ, যাইদ দুর্বল (ও অবিশ্বস্ত)।[১]

যদিও আবু হাতিম রাযী তাঁকে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ত বলেছেন, কিন্তু ইবনে হাব্বান তাঁর গ্রন্থে তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২]

তাঁরা (মুসনাদে আহমাদের ব্যাখ্যাকারগণ) 'সুনানে ইবনে আবি আসিম' এবং তাবরানীর বর্ণিত সূত্রে কাসিম ইবনে হাসসানের উপস্থিতিকে হাদিসের দুর্বলতার কারণ বলে চিহ্নিত করে বলেছেন : "যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' এ বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে কাসিম ইবনে হাস্‌সান সম্পর্কে বলেছেন : 'সে অপ্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণনা করে এবং বিশ্বস্ত নয়।" হাফিজ ইবনে হাজার তাঁর 'তাহযীব' গ্রন্থে ইবনে কাত্তানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন : 'সে বিশ্বস্ত কি বিশ্বস্ত নয় তা অজানা।'[৩]

কিন্তু ইবনে হাব্বান তাঁকে তাঁর গ্রন্থে বিশ্বস্ত বলেছেন। আল আজলী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : 'কাসিম ইবনে হাস্‌সান একজন তাবেয়ী, তিনি বিশ্বস্ত। ইবনে শাহীন আহমাদ ইবনে সালিহের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলেছেন এবং ইবনে হাজার তাঁর 'তাকরীবুত তাহযীব' গ্রন্থে তাঁকে গ্রহণযোগ্য ((مقبول)) বলেছেন।'[৪]

হাদিসে সাকালাইনের অন্যান্য সূত্র সম্পর্কে তাঁরা যে অনিরপেক্ষ বিচার করেছেন তা আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। তাই নমুনা হিসেবে যে কয়টির উল্লেখ করেছি তা অন্যগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট মনে করছি। দুঃখজনকভাবে কখনও কখনও হাদিস (যে হাদিসটি যে সূত্রসমূহ হতে বর্ণিত হয়েছে তাতে বিদ্যমান) বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদদের মতদ্বৈধতার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই হাদিস সম্পর্কে যে কোন ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন যদি কোন ব্যক্তি কোন হাদিসকে দুর্বল প্রতিপন্ন করতে চায় তবে হাদিসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে যে কোন একজনকে দুর্বল দেখানোর জন্য ঐ সকল ব্যক্তির মতকে বেছে নেয় যাঁরা তাকে দুর্বল বলেছেন, যদিও এই দুর্বলতার মাত্রা খুব বেশি না হয় (অর্থাৎ

---

১. দ্রষ্টব্য : শারহে মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১৭২।

২. মিয্‌যী, ইউসুফ, তাহযীবুল কামাল, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫০, হাদিস নং ২০৯৮।

৩. দ্রষ্টব্য : শারহি মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১৭৩।

৪. দ্রষ্টব্য : মিয্‌যী, ইউসুফ, তাহযীবুল কামাল, ২৩তম খণ্ড, পৃ. ৩৪২, হাদিস ৪৭৮৪।

অবিশ্বস্ততার পর্যায়ে না পৌঁছায়)। তেমনি যখন কোন হাদিসকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় তখন ঐ সকল মতকে অবলম্বন করে যা হাদিসের বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্য বলেছে, যদিও এই নির্ভরযোগ্যতার পক্ষে শক্তিশালী দলিল না থাকে।

স্পষ্ট যে, এইরূপ নীতি গ্রহণ কখনই নিরপেক্ষ গণ্য হতে পারে না এবং গবেষকোচিত মনোভাবের পরিপন্থী। বিশেষত যে সকল ক্ষেত্রে হাদিস অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়, তার সমর্থনে অসংখ্য সাক্ষ্য হাদিস বিদ্যমান থাকে এবং হাদিসটির বিষয়বস্তু উম্মতের জন্য ভাগ্য নির্ধারক পরিগণিত হয় (তখন উপরিউক্ত মনোভাব চরম ক্ষতিকর প্রভাব ডেকে আনে)। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, তা উম্মতের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। তাই হাদিসে সাকালাইনের ক্ষেত্রে উক্ত সতর্কতার দাবি হলো– যদি প্রকৃতই হাদিসটি খণ্ডনযোগ্য হতো তবে হাদিসের গবেষকরা সর্বসম্মতভাবে তা দুর্বল প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় ব্রতী হতেন এবং পুনঃপুন তা খণ্ডন করতেন। সুতরাং যখন আমরা দেখি পূর্ববর্তী হাদিসবেত্তারা এমন করেন নি তখন শত শত বছর পর আহমাদ ইবনে হাম্বালের মুসনাদের ব্যাখ্যাকারকদের হাদিসে সাকালাইনের সকল সনদ একে একে (পৃথকভাবে) দুর্বল ও খণ্ডন করার চেষ্টার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। সম্ভবত এ কারণেই বর্তমান কালের অন্যতম প্রসিদ্ধ রেজালশাস্ত্রবিদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, যিনি 'মুসনাদে আহমাদ' এর ব্যাখ্যাকারকদের নিকটই শুধু নন, বরং সর্বগ্রহণযোগ্য একজন বিশেষজ্ঞ আলেম, তিনি এই হাদিসটির একটি সনদ সম্পর্কে মোটামুটি নিরপেক্ষ মন্তব্য করে বলেছেন : 'এই হাদিসটি সহীহ... এবং আমি হাদিসটিকে এ জন্য সহীহ মনে করি যে, এর সপক্ষে সমর্থক হাদিসসমূহ বিদ্যমান যা হাদিসটি সহীহ হওয়ার সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করে।'[১]

যাহোক, এ হাদিসটিতে কোরআনের পাশাপাশি আহলে বাইতের অনুসরণ বিপথগামী না হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। কোরআনের ন্যায় আহলে বাইত নিঃশর্তভাবে বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতা থেকে মুক্তির কারণ এ জন্য যে, আহলে বাইত কোরআনেরই অনুলিপি ও প্রতিবিম্ব এবং আল্লাহর কিতাবের নির্ভুল ব্যাখ্যাকারক। তাই তাঁদের সমগ্র চিন্তা ও কর্ম কোরআনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। কোরআন যেমনভাবে সরল সঠিক পথের হেদায়াতকারী এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ

---

[১] দেখুন : মিয্যী, ইউসুফ, তাহযীবুল কামাল, ২৩তম খণ্ড, হাদিস ৪৭৮৪।

বিভ্রান্তির নামান্তর ও বিপথগামিতার শামিল ঠিক তেমনিভাবে বিষয়টি আহলে বাইতের জন্য প্রযোজ্য, তাই যদি কেউ কোরআনের কোন এক সত্যকে উদ্ঘাটন করে ও সেক্ষেত্রে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় তবে সে ঠিক সেই পরিমাণ আহলে বাইতের ব্যাখ্যা ও হেদায়াত থেকে উপকৃত হয়েছে।[১]

উপরন্তু কোরআন সম্পর্কিত আহলে বাইত প্রদত্ত ব্যাখ্যা কখনই ভুল ও ভ্রান্তিমিশ্রিত নয় এবং তা প্রবৃত্তি উৎসারিতও নয়। যদি তেমন হতো তবে তাঁদের অনুসরণের ক্ষেত্রে বিপথগামী না হওয়ার কোন নিশ্চয়তা থাকত না। এক্ষেত্রে হাদিসে বর্ণিত এ নির্দেশ যে, 'তাদেরকে আঁকড়ে ধর' বৃথা গণ্য হতো। এছাড়া কেবল তাঁরাই কোরআনের সকল জ্ঞান ও অর্থ (বাহ্যিক ও অন্তঃস্থ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল স্তরের জ্ঞান) সম্পর্কে অবহিত। কারণ, যদি তাঁরা কোরআনের কোন একটি অংশের অর্থ সম্পর্কে অনবহিত থাকেন তবে সে অংশের ক্ষেত্রে তাঁরা কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন বলে গণ্য হবেন।[২] অথচ মহানবী (সা.) এরূপ বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছেন। আবদুল কারিম শাহরেস্তানী (মৃ. ৫৪৮ হি.)–যিনি আহলে সুন্নাতের একজন প্রসিদ্ধ আলেম (প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থের রচয়িতা)–এক্ষেত্রে চমৎকার ও অকর্ষণীয় একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন : "(মহানবী সা. এর ইন্তেকালের পর) যাঁরা কোরআন সংকলনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁরা কখনই মহানবীর আহলে বাইতের শরণাপন্ন হন নি। অথচ তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, কোরআন (কোরআনের সর্ববিধ জ্ঞান) আহলে বাইতের জন্য নির্দিষ্ট এবং তাঁরা রাসূল (সা.)-এর বাণী অনুযায়ী তাঁর রেখে যাওয়া দু'টি মূল্যবান (ও ভারী) বস্তুর একটি। তিনি তাঁদের (সংকলকদের) সামনে ঘোষণা করেছিলেন : 'নিশ্চয়ই আমি দু'টি ভারী বস্তু তোমাদের নিকট (মধ্যে) রেখে যাচ্ছি : আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধর', অন্য হাদিস অনুযায়ী 'আমার আহলে বাইত', যদি তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধর তাহলে কখনই বিপথগামী হবে না এবং তারা

---

[১] দ্রষ্টব্য : কুলাইনী, মুহাম্মাদ, আল কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১ এবং ৩৯৯।

[২] কোরআন ও আহলে বাইতের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতার অর্থ এবং তাদের মধ্যে এরূপ সম্পর্কের অবধারিত ফল বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন : মাজলিসী, মুহাম্মাদ বাকির, মিরআতুল উকুল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫-২৩৬।

আমার সঙ্গে হাউজে কাউসারে মিলিত হওয়া পর্যন্ত একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।”[১]

হাদিসে সাকালাইনে আহলে বাইতের পরিচয়

হাদিসে সাকালাইনে যে কখনও আহলে বাইত এবং কখনও ‘ইতরাতি’ (আমার বংশধর) শব্দটিও সংযুক্ত হয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট অর্থাৎ এ শব্দ দু’টির মাধ্যমে বিশেষ ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। কখনই মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীগণ, চাচা আব্বাস ও তার সন্তানরা, চাচাত ভাই আকীল, জাফর ও তাঁদের সন্তানরা, এমনকি আলী (আ.)-এর সকল সন্তানও উপরিউক্ত পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ,

প্রথমত, স্বয়ং আব্বাস, জাফর, আকীল ও তাঁদের সন্তানরা এবং মহানবীর স্ত্রীগণ[২] কখনও এরূপ দাবি করেন নি। তাঁদের থেকে বর্ণিত কোন হাদিসেই তাঁরা এ দাবি করেন নি যে, হাদিসে সাকালাইনে বর্ণিত দু’টি মূল্যবান (ও ভারী) বস্তুর একটি হলেন তাঁরা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) এবং তাঁর এগারজন সন্তান ব্যতিক্রম। বনি হাশিমের উক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং রাসূলের স্ত্রীগণ শুধু এ অর্থে নবীর আহলে বাইত হওয়ার দাবি করেছেন যে, তাঁরা রাসূলের গৃহের অধিবাসী অথবা তাঁর সঙ্গে রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত (অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাঁদের দাবির সত্যতা যাচাইয়ের আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না)। কখনই তাঁরা কোরআনে সমকক্ষ বলে নিজেদেরকে দাবি করেন নি। এর সপক্ষে দলিল হলো যেহেতু তাঁরা কোরআনের সকল জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন না সেহেতু এমন দাবি করতে পারেন না। অবশ্য তাঁরা তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী কোরআন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) অথবা আলী (আ.) থেকে কিছু জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, যদি উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ কোরআনের সমপর্যায়ে হতেন এ অর্থে যে, মানুষ তাঁদের রীতি ও পথ অনুসরণ করলে বিপথগামিতা থেকে মুক্তি পাবে সে ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কোনরূপ মতপার্থক্য এবং তাঁদের অনুসৃত পথগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য থাকত না অর্থাৎ যেমন কোরআনের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই তেমনি যাঁরা

---

[১] শাহরেস্তানী, আবদুল কারিম, মাফাতিহুল আসরার, পৃ. ১২১।

[২] হাদীসে সাকালাইনের কোন কোন বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে নবীর (সা.) স্ত্রীগণ যে এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নন তা বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য : মুসলিম, সহীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৭৩, হাদিস ২৪০৮।

কোরআনের সমকক্ষ ও প্রতিবিম্ব হবেন তাঁদের মধ্যেও কোনরূপ বৈপরীত্য থাকতে পারে না এবং সকল প্রকার মতভেদ থেকে তাঁরা মুক্ত থাকবেন।

তৃতীয়ত, নিঃসন্দেহে বলা যায়, মহানবী (সা.) হাদিসে সাকালাইনে উল্লিখিত আহলে বাইত কারা তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। কারণ, তিনি উক্ত হাদিসে মানবজাতিকে হেদায়াতের পথ কোনটি তা দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। এ অবস্থায় যদি তাঁদেরকে (যে ব্যক্তিবর্গ উক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন) পরিচিত না করান তাহলে তাঁর উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কেননা, নবুওয়াতের গৃহের সংশিষ্ট যে কোন ব্যক্তি নিজেকে উক্ত মহান মর্যাদার অধিকারী বলে দাবি করতে পারেন।

এ কারণেই কোন কোন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মহানবী (সা.) হাদিসে সাকালাইন বর্ণনা করেন তখন কিছুসংখ্যক সাহাবী তাঁকে আহলে বাইত ও ইতরাত কারা সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি তখন বলেন : আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হুসাইনের বংশধর থেকে যারা ইমাম হবে।[১] এ সম্পর্কে শিয়া-সুন্নি উভয় সূত্রে হাদিসসমূহ বর্ণিত হয়েছে।[২] এক্ষেত্রে হাদিসগুলোর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই। অন্যভাবে বলা যায়, রাসূল (সা.) থেকে শিয়া-সুন্নি উভয় সূত্রে বর্ণিত কোন হাদিসেই উক্ত অর্থে আহলে বাইত (যাঁরা কোরআন থেকে অবিচ্ছেদ্য ও তার সমপর্যায়ে স্থান লাভ করেছেন) বলতে বারজন নিষ্পাপ ইমাম ব্যতীত অন্য কাউকে বলা হয় নি।

এ কারণেই আহলে সুন্নাতের আলেমগণ যদি মহানবী (সা.) থেকে সহীহ (বিশ্বস্ত রাবী বা বর্ণনাকারীদের) সূত্রে বর্ণিত 'বারজন খলিফা' সম্পর্কিত হাদিসের[৩] ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে

---

[১] সাদুক, মুহাম্মাদ, মায়ানীউল আখবার, 'মানাস সাকালাইন ওয়াল ইতরাত' অধ্যায়, পৃ. ৯০-৯১, হাদিস ৪ [এই হাদিসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ]: সাদুক, মুহাম্মাদ, কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন নি'মাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৪-২৪৫; হুররে আমেলী, মুহাম্মাদ, ইসবাতুল হুদা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৯, হাদিস ১৬৭ এবং পৃ. ৪৯৯, হাদিস ২১০; হামুয়ী, ফারায়েদুস সিমতাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১২-৩১৮, হাদিস ২৫০; ইবনে উকদা, কিতাবুল বিলায়া, পৃ. ২০২ ইত্যাদি।

[২] দ্রষ্টব্য : সাদুক, মুহাম্মাদ, কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন নি'মাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০, অধ্যায় ২২, হাদিস ৬৪ এবং পৃ. ২৫৩, হাদিস ৩; সাদুক, উয়ুনু আখবারির রিযা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭, হাদিস ২৫; কুন্দুজী, সুলাইমান, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দা, পৃ. ৪৩০; তাবারসী, ফাজল, ইলামুল ওয়ারা ওয়া আলামুল হুদা, পৃ. ৩৭৫।

[৩] এই হাদিসটি শিয়া-সুন্নি উভয় মাযহাবের হাদিস গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন সূত্রে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ঐ হাদিসগুলোতে ইসলামের সম্মান, ধর্মের টিকে থাকা, উম্মতের সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়া এবং আরো অন্যান্য বিষয়ে বারজন খলিফার মাধ্যমে ঘটবে বলা হয়েছে। উভয় মাযহাবের যে সকল গ্রন্থে এ হাদিসটির সূত্রসমূহ ও অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা

যে দিশেহারা অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন এবং মতদ্বৈধতার চূড়ান্তে পৌঁছেছেন তা থেকে মুক্তি পেতে চান, নিরুপায় হয়ে তাঁদেরকে উক্ত হাদিসের সমস্যা সমাধানের জন্য হাদিসে সাকালাইন এবং আহলে বাইত সম্পর্কে বর্ণিত অন্যান্য হাদিসের শরণাপন্ন হতে হবে।

শিয়া সূত্রসমূহে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদিসসমূহে (এবং আহলে সুন্নাতের কোন কোন হাদিসে) এ সম্পর্কিত (আহলে বাইত কারা) মহানবী (সা.)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকে ইমাম সাদিক (আ.) যেভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা উল্লিখিত হয়েছে। আবু বাসির ইমাম সাদিক (আ.)-কে প্রশ্ন করলেন : 'অনেকে বলে যে, কেন পবিত্র কোরআনে আলী (আ.) এবং মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইতের নাম উল্লিখিত হয়নি?' ইমাম (আ.) বললেন : "তাদেরকে বল, (পবিত্র কোরআনে) নামাযের নির্দেশ রাসূলের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তা তিন রাকআত না চার রাকআত তা আল্লাহ (কোরআনে) বর্ণনা করেন নি। এক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সকলের জন্য তা বর্ণনা করেছেন। যাকাতের বিধানও আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন, কিন্তু (কোরআনে) বর্ণিত হয় নি যে, প্রতি চল্লিশ দিরহামের মধ্যে এক দিরহাম যাকাত হিসেবে দিতে হবে যা রাসূলুল্লাহ বর্ণনা করেছেন... 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর তাঁর রাসূলের এবং কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্তদের' (সূরা নিসা : ৫৯) আয়াতটি আলী (আ.) এবং ইমাম হাসান ও হুসাইন (আ.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। (এজন্যই) আল্লাহর রাসূল (সা.) আলী (আ.) সম্পর্কে বলেছেন : 'আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক (মাওলা) এবং অন্যত্র বলেছেন : 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলে বাইত সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার আদেশ দিচ্ছি। কারণ, আমি মহান আল্লাহর নিকট চেয়েছি যে, তিনি যেন আমার সঙ্গে হাউযে কাওসারে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এ দু'য়ের মাঝে বিচ্ছেদ না ঘটান। অতঃপর তিনি আমার প্রার্থনাকে গ্রহণ করেছেন (আমাকে তার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন); রাসূল (সা.) আরো বলেছেন : 'তাদেরকে শিক্ষা দিতে যেও না (দিও না), কেননা, তারা তোমাদের সকলের থেকে জ্ঞানী।' তাঁদের সম্পর্কে এও বলেছেন : 'তারা কখনই তোমাদেরকে হেদায়াতের দ্বার (পথ) থেকে বের করে দেবে না এবং

জানতে দেখুন : আরবিলী, আলী, কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৩০; সুয়ুতী, জামালুদ্দীন, তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১১-১৩; আলে মুহসেন, আলী, মাসায়িলুল খিলাফিয়াহ ওয়া রাইউল হাক ফিহী, পৃ. ৯-৪৩।

কখনই তোমাদেরকে বিপথগামিতা ও বিভ্রান্তির দ্বারে প্রবেশ করাবে না।' যদি তিনি এ বিষয়ে কিছু না বলতেন এবং তাঁর আহলে বাইত কারা তা বর্ণনা না করতেন তবে অমুক ও অমুকের বংশধররা নিজেদেরকে রাসূলের আহলে বাইত বলে দাবি করত। এ কারণেই মহান আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে তাঁর নবীর কথাকে সত্যায়ন করে অবতীর্ণ করলেন : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ চান হে আহলে বাইত! তোমাদের থেকে সকল ধরনের পঙ্কিলতা (অপবিত্রতা) দূর করতে এবং সর্বোতভাবে তোমাদেরকে পবিত্র করতে।' আর তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) আলী, হাসান, হুসাইন ও ফাতিমাকে (আলাইহিমুস সালাম) উম্মে সালামার গৃহে স্বীয় চাদরের নিচে সমবেত করে বললেন : 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই সকল নবীর 'আহল' (বিশেষ ও পারিভাষিক অর্থে নিজস্ব পরিবার) এবং 'সাকাল' (উত্তরাধিকার হিসেবে উত্তরসূরিদের জন্য রাখা মূল্যবান বস্তু) ছিল, আমরাও 'আহল' ও 'সাকাল' রয়েছে, তারা হল এই ব্যক্তিবর্গ (যারা চাদরের নিচে রয়েছে)।' (রাসূল সা. এর স্ত্রী) উম্মে সালামা বললেন : 'আমি কি আপনার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নই?' তিনি বললেন : 'নিশ্চয়ই তুমি কল্যাণের মধ্যে রয়েছ। কিন্তু এরাই হলো আমার 'আহল' ও 'সাকাল'।"[১]

ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল হাদী (আ.)-ও হাদিসে সাকালাইনকে পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদার ৫৫ নং আয়াতের তাফসীরে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে আহলে বাইতকে উল্লিখিত অর্থেই সঠিক বলেছেন।[২]

চতুর্থত, মহানবী (সা.)-এর গৃহের সঙ্গে সংশিষ্ট সকল ব্যক্তির জীবনী পর্যালোচনা করলে এই সত্য প্রকাশিত হয় যে, শুধু হযরত আলী (আ.) এবং পরবর্তীকালে তাঁর বংশের এগারজন ইমাম কোরআনের সকল জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন।[৩]

---

১. কুলাইনী, মুহাম্মাদ, আল কাফী, কিতাবুল হুজ্জাত, মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.) ইমামগণের (মনোনয়নের) বিষয়ে যা বলেছেন এ সম্পর্কিত অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭; আরো দেখুন : আয়াশী, মুহাম্মাদ, তাফসীরুল আয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৮, হাদিস ১০১২ এবং পৃ. ৪১০, হাদিস ১০১৩; হামুয়ী, ফারায়েদুস সিমতাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭; ইবনে উকদা, কিতাবুল বিলায়াহ, পৃ. ২০২; হাসকানী, উবাইদুল্লাহ্, শাওয়াহেদুত তানযীল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১, হাদিস ২০৩।

২. দ্রষ্টব্য : মাজলিসী, মুহাম্মাদ বাকির, বিহারুল আনওয়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৫ এবং ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

৩. উদাহরণস্বরূপ : কুলাইনী, মুহাম্মাদ, আল কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪ এবং ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০, হাদিস ৫৮৬; নাহজুল বালাগা, খুতবা ১২১, ১২৮; আর রিয়াদ, মুহিবুদ্দীন তাবারী, ২য় খণ্ড,

আলী (আ.) যে জ্ঞান রাসূল (সা.) থেকে অর্জন করেছিলেন তা তাঁর পরবর্তী ইমামদের কাছে একের পর এক স্থানান্তরিত হয়েছে। এ কারণেই কোন হাদিস এবং বর্ণনাতেই এ কথা আসে নি যে, তাঁদেরকে কোন আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যার উত্তর তাঁরা দিতে পারেন নি।[১] এমনকি প্রতিপক্ষের সঙ্গে (যে কোন ধর্মের ও মতের অনুসারী হোক না কেন) যুক্তি-তর্কে কখনই তাঁরা পরাস্ত হন নি বা তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হন নি।[২] অথবা কেউ পারে নি তাঁদের উপস্থাপিত দলিলকে খণ্ডন করতে। তেমনি যাঁরা সত্যান্বেষী ছিলেন তাঁরা সবসময়ই পবিত্র ইমামগণের জ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদার কথা স্বীকার করেছেন এবং কেউ কেউ কোরআনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং তার বাণীর অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে সত্যকে উদ্ঘাটনের বিষয়ে তাঁদের অনুপম অবস্থানের কথা স্বীকার করেছেন।[৩]

পঞ্চমত, যদি 'আহলে বাইত' এর পরিচিতি নিয়ে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয় তাহলে 'আহলে বাইত' হওয়ার বিষয়ে যে ব্যক্তিদের বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে তাঁদেরকে অবশ্যই তার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরতে হবে। মুসলিম মনীষীদের সকলেই মুবাহিলার ঘটনা বর্ণনায় মহানবী (সা.) যে আহলে বাইতের সদস্য হিসেবে হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের প্রতি ইশারা করে বলেছেন : 'হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত'[৪] এবং তেমনি আয়াতে তাতহীর (আহযাব

পৃ. ১৯৮; ফাতহুল বারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬; সুয়ুতী, তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১২৪, আল ইতকান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৯; তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮; উমদাতুল কারী , ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯; আল গাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৩; ইবনে কাসির, তাফসীরে ইবনে কাসির, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩১, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮; মিফতাহুস সায়াদাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০।

[১] দ্রষ্টব্য : কুলাইনী, মুহাম্মাদ, আল কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০।

[২] এ বিষয়ে জানার জন্য ৬ষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর অন্যতম আলেম আহমাদ ইবনে আলী তাবারসী রচিত 'আল ইহতিজাজ' গ্রন্থটি পড়াই যথেষ্ট। তিনি এ গ্রন্থে ইমামদের উপস্থাপিত প্রমাণসমূহ সংকলন করেছেন।

[৩] উদাহরণস্বরূপ বিশিষ্ট তাবেয়ী কাতাদার সঙ্গে ইমাম বাকির (আ.)-এর বিতর্ক দ্রষ্টব্য; হুররে আমেলী, মুহাম্মাদ, ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২৭তম খণ্ড, অধ্যায় ১৩, হাদিস ২৫, এবং আলী ইবনে জাহমের সঙ্গে ইমাম রেযা (আ.)-এর বিতর্ক দ্রষ্টব্য; মাহমুদী, মুহাম্মাদ জাওয়াদ, তারতীবুল আমালী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭-১১ এবং অন্যান্য।

[৪] দ্রষ্টব্য : হাকিম নিশাবুরী, মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫০; মুসলিম, সহীহ, কিতাবু ফজায়িলিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৭১, হাদিস ২৪০৪; তিরমিযী, মুহাম্মাদ, সুনানুত তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৫, হাদিস ২৯৯৯ এবং পৃ. ৬৩৮, হাদিস ৩৭২৪; নাসায়ী, আহমাদ, খাসায়িস, পৃ. ৩৩-৩৪, হাদিস ১১; বায়হাকী, আহমাদ, সুনানে কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০, হাদিস ৬০৮।

: ৩৩) অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটেও উক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি নির্দেশ করে যে রাসূল (সা.) এই কথা : ‘হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত এবং আমার সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত...’[1] বলেছেন তার উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামাকে তাঁর আহলে বাইতের বহির্ভূত বলেছেন। তাঁরাই যে উক্ত দু'টি ঘটনায় (মুবাহিলার ঘটনা ও আয়াতে তাতহীর অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হাদিসে কিসায়) আহলে বাইতের সদস্য হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিসার ঘটনার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা এ বিষয়ে একমত যে, হাদিসে সাকালাইনে বর্ণিত আহলে বাইতে ইমাম হুসাইনের বংশোদ্ভূত নয়জন ইমামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

ষষ্ঠত, হাদিসে সাকালাইনে বর্ণিত আহলে বাইতকে এমন উন্নত মানুষ ও এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে যে, তাঁরা দরুদ পাঠের (নামাযের দরুদ) মধ্যে মহানবী (সা.)-এর পাশাপাশি এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হবেন। সহীহ সূত্রসমূহে বর্ণিত কয়েকটি মুতাওয়াতির হাদিস নির্ভরযোগ্য (আহলে সুন্নাতের নিকট) গ্রন্থসমূহে, যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যা রাসূল (সা.)-এর কিছুসংখ্যক সাহাবী, যেমন : আবু সাঈদ খুদরী, বাশির বিন সাদ, আবু হুরাইরা, বুরাইদাহ আল খুজায়ী এবং অন্যরা তাঁর ওপর দরুদ পড়ার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন করার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি (সা.) বলেছেন : এভাবে আমার ওপর দরুদ পড় :

الهم صلّ على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم إنک حميد
مجيد و بارک على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم.

এ হাদিসটি ১৭ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে।[2]

হাদিসবেত্তারা এই হাদিসটির সূত্রসমূহকে শক্তিশালী গণ্য করেছেন এবং সনদে বিদ্যমান বর্ণনাকারীদেরকে (রাবী) বুখারী ও মুসলিমের অন্যতম স্বীকৃত বর্ণনাকারী বলেছেন।

[1] ‘হাদিসে কিসা’র ঘটনা এবং এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে তাতহীর অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত হাদিসসমূহ–যাতে মহানবী (সা.) তাঁর আহলে বাইত কারা তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আয়াতে তাতহীরে উল্লিখিত আহলে বাইতে শুধু আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন অন্তর্ভুক্ত, অন্য কেউ নয়–সংখ্যায় এত অধিক যে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু হাকিম নিশাবুরী ৫টি সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী ও মুসলিম উভয়ের অথবা অন্তত একটির সনদগুলোকে (সূত্রসমূহ) সহীহ বলেছেন। দ্রষ্টব্য : হাকিম নিশাবুরী, মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬-১৪৮।

[2] দ্রষ্টব্য : জামানী, মুহাম্মাদ, হাসান, শিয়া-সুন্নি দুই মাযহাবের দৃষ্টিতে দরুদ পড়ার পদ্ধতি, পৃ. ৩৪-৩৭।

কোন কোন হাদিসে (অন্য সূত্রে বর্ণিত) মহানবী (সা.) স্বীয় উম্মতকে অসম্পূর্ণ ও কর্তিত দরুদ অর্থাৎ শুধু তাঁর ওপর দরুদ পড়ে তাঁর বংশধরদেরকে দরুদ থেকে বাদ দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন।[১]

কোন কোন সুন্নি হাদিস বিশেষজ্ঞের মতে, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে তাঁর বংশধরদের ওপর দরুদ পড়ার বিষয়টিতে ঐকমত্য রয়েছে।[২]

রাসূল (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের ওপর দরুদের সঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের ওপর দরুদ পড়ার বিষয়টি পরস্পর সংযুক্ত হওয়ার রহস্য এটা হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে আল্লাহর নবী এবং তাঁদের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি ছিলেন যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইবরাহীম (আ.) আনীত শরীয়ত ও দ্বীনকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় অবিরত চেষ্টা চালিয়েছেন। এদিক থেকে তাঁরা মহানবী (সা.)-এর বংশধরদের ন্যায়, যাঁরা ইসলামের মহাসত্যকে প্রচার ও তাঁর আনীত শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা ও পুরুজ্জীবিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন ও আছেন। সম্ভবত এজন্যই এই দুই নবী ও তাঁদের বংশধরদের ওপর দরুদ পাশাপাশি আনা হয়েছে।

সপ্তমত, হাদিসে সাকালাইনে উল্লিখিত আহলে বাইত হলেন তাঁরাই যাঁরা রাসূল (সা.)-এর অন্যান্য বাণীতেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসহ বর্ণিত হয়েছেন। যেমন 'আমার আহলে বাইত নূহের মুক্তি তরণী'[৩], 'আমার উম্মতের বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষাস্থল'[১]

---

১. প্রাগুক্ত।

২. হাইতামী, ইবনে হাজার, আহমাদ, আস সাওয়ায়েকুল মুহরিকা, পৃ. ২৩৪।

৩. 'হাদিসে সাফিনা' (বা নূহের তরণী শীর্ষক হাদিসে মহানবী সা. স্বীয় আহলে বাইতকে হযরত নূহ আ.-এর তরণীর সাথে তুলনা করে বলেন, যে তাতে আরোহণ করবে মুক্তি পাবে এবং যে তা না করবে সে নিমজ্জিত হবে) শিয়া-সুন্নি উভয় সূত্রে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং তন্মধ্যে কোন কোনটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত। দ্রষ্টব্য: হাকিম নিশাবুরী, মুসতাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৩ এবং ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫০-১৫১; হিন্দী, মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩২, হাদিস ৪৪২৯; ইবনে মাগাজিলী, মানাকিব, পৃ. ১৩২-১৩৪, হাদিস ১৭৩-১৭৭, তিনি হাদিসটি ৫টি সনদে (সূত্রে) বর্ণনা করেছেন; শাহরেস্তানী, আবদুল কারিম, মাফাতিহুল আসরার, পৃ. ১৯৯; ইবনে হাজার, আস সাওয়ায়েকুল মুহরিকা, পৃ. ১৮৪ ও ২৩৪; হামুয়ী, ফারায়েদুস সিমতাইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩, হাদিস ৫১৭ এবং পৃ. ২৪৬, হাদিস ৫১৯; তাবরানী, সুলাইমান, আল মু'জামুস সাগীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯ এবং ২য় খণ্ড, পৃ.২২; আবু নাঈম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৬ ইত্যাদি এবং শিয়া উৎসসমূহের মধ্যে হুররে আমেলী, মুহাম্মাদ, ইসবাতুল হুদাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫২, হাদিস ৩৮৩ ও ৩৮৫।

তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ রাসূলের সঙ্গেই যুদ্ধ এবং তাঁদের সঙ্গে সন্ধি রাসূলের সঙ্গে সন্ধির শামিল।[২]

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য যে কেউ মহানবী (সা.)-এর গৃহের সঙ্গে সংশিষ্ট হওয়ার কারণে অর্জন করতে পারেন না। এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট যাঁরা কোরআনের পূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছেন, যাঁদের জীবন পদ্ধতি ও রীতি কোরআনের পূর্ণ অনুসরণের প্রতিচ্ছবি এবং কোরআনের ন্যায় ভুল-ত্রুটি ও ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে। কোরআন এবং আহলে বাইতের মধ্যে বিদ্যমান এই সম্পর্কটি ইমাম আলী (আ.) তাঁর সুন্দর ও গভীর অর্থবহ এক বাণীতে চিত্রিত করেছেন। তিনি তাঁর অলৌকিক বাগ্মিতাপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন :

فمضی صلی الله علیه و آله لسبیله و ترک کتاب الله و اهل بیته امامین لا یختلفان و
اخوین لا یتخاذلان و مجتمعین لا یتفرقین...

'অতঃপর রাসূল (আল্লাহ তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ তাঁর ও তাঁর বংশধরদের ওপর বর্ষণ করুন) ইন্তেকাল করলেন এবং আল্লাহর কিতাব ও স্বীয় আহলে বাইতকে রেখে গেলেন। এ দু'টি (তাঁর উম্মতের জন্য) নেতা ও পথনির্দেশ যাদের মধ্যে কখনই মতপার্থক্য ও বৈপরীত্য দেখা যাবে না, এ দু'টি একে অপরের ভ্রাতা যারা একে

---

১. দ্রষ্টব্য : হাকিম নিশাবুরী, মুসতাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৮, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯ এবং ৪৫৭; হাইতামী, ইবনে হাজার, সাওয়ায়েকুল মুহরিকা, পৃ. ১৪০ ও ১৯১; তাবারী, মুহিবুদ্দীন, যাখায়িরুল উশবা, পৃ. ১৭; কুন্দুযী, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দা, পৃ. ১৯-২১ ও ১৮৮; হামুয়ী, ফারায়েদুস সিমতাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫ এবং ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫২, হাদিস ৫২২। এই হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন : আকাশের তারকারাজি যেমন পৃথিবীবাসীদের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ (দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে সমুদ্র ও মরুপথে দিক হারিয়ে বিপদে পতন থেকে), আমার আহলে বাইত তেমনি পরস্পর বিভেদ থেকে মুক্তির স্থল। সুতরাং কোন দল যদি তাদের বিরোধিতা করে তবে অন্তর্দ্বন্দ্বে পতিত হবে এবং শয়তানের দলের অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য হবে।

২. এই হাদিসটি যাইদ ইবনে আরকাম মহানবী (সা.) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : যে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবো, আর যারা তোমাদের সঙ্গেঁ সন্ধি করবে আমিও তাদের সন্ধি করব। দ্রষ্টব্য : হাকিম নিশাবুরী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯; জাহাবী, মুহাম্মাদ, খালখীসে মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯; তিরমিযী, মুহাম্মাদ, সুনানে তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০, হাদিস ৩৯৬২; ইবনে মাজা, সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২, হাদিস ১৪৫; হাসকানী, উবাইদুল-াহ্, শাওয়াহেদুত তানজীল, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭; খাওয়ারেজমী (খরাজমী), মুয়াফ্ফাক, মানাকিব, পৃ. ৯১; তাবরানী, সুলাইমান, আল মো'জামুস সাগির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩; হামুয়ী, ফারায়েদুস সিমতাইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮, হাদিস ৩৮২; খাতিব বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ।

অপরকে ত্যাগ করবে না (হীন ও লাঞ্ছিত করবে না), তারা সংঘবদ্ধ, কখনই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।[১]

সুতরাং শুধু তাঁরাই কোরআনের সমমূল্যের অধিকারী হিসেবে কোরআনের সমকক্ষ এবং এ জন্যই মহানবী তাঁদের বিষয়ে বিশেষভাবে সুপারিশ করেছেন। নতুবা মহানবী (সা.)-এর জন্য কখনই এটা মানানসই নয় যে, তিনি তাঁর সঙ্গে জাতিগত বা বংশগত সম্পর্ক থাকার কারণে কোন মুমিনের জন্য তেমন মর্যাদাকর অবস্থানের কথা ঘোষণা করবেন। কেননা, তা আলাহর ওহী, রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত, জীবন পদ্ধতি ও রীতির পরিপন্থী। তিনি ঐশী শিক্ষার পরিপন্থী কোন আচরণ করতে পারেন না।

আমাদের দৃষ্টিতে হাদিসে সাকালাইনের (হাদিসসমূহের মধ্যে যার স্থান শীর্ষে ও উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্যের) বিষয়বস্তু আমাদের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট এবং এর যথার্থতা আমাদেরকে অন্য হাদিস থেকে প্রমাণ উপস্থাপন থেকে অমুখাপেক্ষী করে। তদুপরি এখানে আমরা সূচি আকারে কিছুসংখ্যক হাদিসের উলেখ করছি এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দায়িত্ব পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।

রাসূল (সা.) তাঁর আহলে বাইতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন : 'তারা কোরআনের সাথে এবং কোরআন তাদের সাথে, তারা কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমার সঙ্গে হাউজে কাওসারে মিলিত হবে...।'[২]

রাসূলের আহলে বাইত জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে সর্বদা কোরআনের সঙ্গে থাকবেন এবং কোরআনের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত সকল জ্ঞান তাঁদের নিকট রয়েছে। যদি তাঁরা কোরআনের কোন একটি অংশের জ্ঞান না রাখেন তবে সেক্ষেত্রে কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন বলে গণ্য হবেন। অথচ উপরিউক্ত বাণীটি এ সম্ভাবনাকে নাকচ করেছে।

ইমাম আলী (আ.)-এর 'নাহজুল বালাগা'ও এরূপ অর্থের হাদিসে পূর্ণ। তিনি বিভিন্ন উপলক্ষে কোরআনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে আহলে বাইতের বিশেষত্ব এবং কোরআনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁদের অতুলনীয় অবস্থানের বিষয়টির প্রতি ইশারা করে বলেছেন : 'জেনে রাখ, যতক্ষণ হেদায়াত (ও সত্যপথ) পরিত্যাগকারীকে না চিনবে

---

১. ইবনে তাউস, আলী কাশফুল মুহাজ্জা, পৃ. ২৩৮

২. কুলাইনী, মুহাম্মাদ, আল কাফি, কিতাবুল হুজ্জাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১, হাদিস ৫; ইবনে উকদা, আহমাদ, কিতাবুল বিলায়াহ, পৃ. ১৯৯, হামুয়ী, ফারায়িদুস সিমতাইন ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪, হাদিস ২৫০।

ততক্ষণ হেদায়াত কী, তা জানতে পারবে না এবং যতক্ষণ আল্লাহর কিতাবের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের না চিনবে, ততক্ষণ কে ঐ প্রতিশ্রুতি পালন ও রক্ষা করেছে তা জানতে পারবে না। যতক্ষণ কোরআনকে কে দূরে ঠেলে দিয়েছে তা না জানবে ততক্ষণ (কে কোরআনকে আঁকড়ে ধরেছে তাকে চিনতে পারবে না এবং ফলশ্রুতিতে) কোরআনকে আঁকড়ে ধরতে পারবে না। সুতরাং হেদায়াত, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং কোরআনকে আঁকড়ে ধরার পদ্ধতি তার প্রকৃত অধিকারীদের (মহানবীর আহলে বাইত ও পবিত্র ইমামগণ) নিকট থেকে অর্জন (ও শিক্ষালাভ) কর। নিশ্চয় তারাই জ্ঞানে প্রাণদানকারী এবং অজ্ঞতার মৃত্যুদানকারী। তারা হলো এমন ব্যক্তি যাদের প্রজ্ঞা (বর্ণিত বিধান) তোমাদেরকে তাদের জ্ঞান সম্পর্কে খবর দেয়, তাদের নীরবতা তাদের বাণীর সৌন্দর্যকে (কথার যৌক্তিকতা), তাদের বাহ্যিকতা (বাহ্যিক আচরণ) তাদের অন্তরের রূপকে প্রকাশ করে। তারা কখনও দ্বীনের বিরোধিতা করে না এবং (কোন ধর্মীয় বিধানের সঙ্গেই) তারা মতানৈক্য রাখে না। (ও বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই)। সুতরাং দ্বীন তাদের সম্পর্কে সত্য সাক্ষী এবং নির্বাক বক্তা।'[১]

ইমাম আলী (আ.) যাঁদেরকে এই খুতবায় হেদায়াতের অধিকারী, জ্ঞানের প্রাণ, অজ্ঞতার মৃত্যু ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে প্রশংসা করেছেন তাঁরা মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইত ব্যতীত অন্য কেউ নয়। কারণ, তিনি তাঁর অন্যান্য খুতবায় অনুরূপ বৈশিষ্ট্য আহলে বাইতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।[২]

'নাহজুল বালাগা'য় আহলে বাইত সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্য এত অধিক যে, শুধু তার বর্ণনা তালিকা প্রস্তুত করতে কয়েক পৃষ্ঠা লাগবে।[৩]

ইমাম আলী ইবনুল হুসাইনের (যাইনুল আবেদীনের) দোয়া সমগ্র 'সহীফায়ে সাজ্জাদীয়া'তেও আহলে বাইত সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। যেমন- তিনি বলেছেন : 'হে আল্লাহ! যিনি মুহাম্মাদ এবং তাঁর আহলে বাইতকে (মুহাম্মাদান ওয়া

---

[১] নাহজুল বালাগা, খুতবা ১৪৭।

[২] উদাহরণ স্বরূপ ২৩৯ নং খুতবা।

[৩] উদাহরণ স্বরূপ : ২, ৮৬, ৯৪, ৯৭, ১০৯, ১২০, ১৪৪ ও ১৫৪ নং খুতবা এবং ১০৯ ও ১৪৭ নং হিকমাত। দ্রষ্টব্য : নাহজুল বালাগা।

আলিহী) বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন... এবং তাঁদেরকে নবিগণের উত্তরাধিকারী করেছেন... এবং তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল জ্ঞান... ।’[১]

অপর একটি দোয়ায় বলেছেন : ‘হে আল্লাহ! আপনি তা (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন আপনার নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী)-এর ওপর কোনরূপ ব্যাখ্যা ছাড়া (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত রূপে) এবং তার মধ্যে বিদ্যমান অলৌকিক ও রহস্যময় আশ্চর্য জ্ঞান পূর্ণরূপে তাঁর প্রতি ইলহাম (আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অন্তরে প্রতিফলিত) করেছেন এবং আমাদেরকে তার (কোরআনের) জ্ঞানের উত্তরাধিকারী করেছেন এবং এর মাধ্যমে যারা এ সম্পর্কে অবগত নয় তাদের ওপর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তাদের ওপর শক্তিশালী করেছেন যারা তা বহনের ক্ষমতা রাখে না।’

এক্ষেত্রে অবশ্যই ঐ সকল রেওয়ায়েতের (হাদিসের) প্রতিও ইশারা করা বাঞ্ছনীয় যেগুলোতে আলী (আ.) সংকলিত কোরআন (যা কোরআনের তাফসীর এবং অর্থগত ব্যাখ্যা সম্বলিত ছিল) তাঁর স্থলাভিষিক্ত পবিত্র ইমামগণের নিকট স্থানান্তর (বংশ পরম্পরায়)[২] এবং কোরআনের ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ জ্ঞানের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। সেই সাথে ইমাম সাদিক এবং বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদিস এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যা মুহাম্মাদ আইয়াশী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ‘ইলমুল আয়িম্মা বিততাভিল’[৩] শিরোনামে বর্ণনা করেছেন। ‘বাসায়িরুদ দারাজাহ’ গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৬, ৭, ৮ এবং ১ম অধ্যায়ে এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১০, ১১, ১২ ও ১৫তম অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবু জাফার কুলাইনী তাঁর ‘কাফী’ গ্রন্থের ‘কিতাবুল হুজ্জাত’ অংশে অনেকগুলো অধ্যায়ে বিভিন্ন শিরোনামে এ বিষয়ের হাদিসসমূহ বর্ণনা করেছেন। বাহরানী তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় ‘বাবুন ফি

---

১. সহীফায়ে সাজ্জাদীয়া, ৪ নং দোয়া।

২. উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য : কুলাইনী, মুহাম্মাদ, আল কাফি, কিতাবুল হুজ্জাত, ‘আররাদ্দু ইলাল কিতাব ওয়াস সুন্নাত’ অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬২ (ইন্নাল আয়িম্মাতা (আ.) ওয়ারাসাতুল ইলম, ইয়ারিসু বা’দুহুম, বা’দ্বান ইলমান) অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১-২২৩; ‘ইন্নাল আয়িম্মাতা ওয়ারিসু ইলমান্নাবী’ ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৩-২২৬ এবং ইন্না লাম ইয়াজমায়িল কুরআন ইলাল আইম্মাতু আলাইহিমুস সালাম ওয়া ইন্নাহুম ইয়ালামুনা ইলমাহু কুলাহু’ অধ্যায় ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৮-২২৯।

৩. দ্রষ্টব্য : আইয়াশী, মুহাম্মাদ, তাফসীরুল আইয়াশী, পৃ. ৯০-৯৫।

আন্নাল কোরআনা লাম ইয়াজমায়াহু কামা উনযিলা ইল্লাল আইম্মাহ’ শিরোনামে এ সংশ্লিষ্ট কিছুসংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১]

‘মাজদুল বাইয়ান’ তাফসীরের রচয়িতাও তাঁর তাফসীরে ‘ফি নাবযাতি মিম্মা জাআ ইন্না ইলমাল কুরআন কুল্লাহু ইন্নামা হুয়া ইন্দাহুম ওয়া মা আশবাহা যালিক’ শিরোনামে এ বিষয়ক হাদিসসমূহের উলেখ করেছেন।[২]

এই হাদিসসমূহের মধ্যে দুর্বল (যঈফ) সূত্রে বর্ণিত হাদিসও থাকার এবং কোন কোন হাদিসের বিষয়বস্তু প্রামাণ্য অর্থ বহন না করার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু এ সংশ্লিষ্ট হাদিসের সংখ্যা এত অধিক যে, তা থেকে ন্যূনতম তাঁদের জ্ঞানের সার্বিকতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইত এর ক্ষেত্রে ‘আলাইহিস্ সালাম’ বলা

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইত (আ.)-এর নাম উচ্চারণ করার পর কি আমরা ‘আলাইহিস্ সালাম’ বলতে পারব অর্থাৎ হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন এর নাম উচ্চারণ করার পর ‘আলাইহিস্ সালাম’ বা ‘আলাইহাস সালাম’ বলতে বলতে পারব কি? এ ব্যপারে জনগণের ধারণা হচ্ছে যে, কেবল নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আর কারো ওপর আলাইহিস্ সালাম পড়া জায়েয হবে না। রাসূলের সাহাবীদের ওপর ‘রাদিয়াল্লাহু আনহ’ এবং সাহাবী না হয়ে অন্য কোন বুযুর্গ ব্যক্তি, যেমন- আলেম ও ওয়ালী হলে তাঁদের নামের শেষে ‘রহমাতুল্লাহ আলাইহ’ পড়তে হবে। এখন আমরা দেখব যে, এ ধারণা আসলে সঠিক কিনা। প্রথমে ‘সহীহ আল-বুখারী’ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করব : এ গ্রন্থে হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, ইমাম হুসাইন-এর নামের পরে ‘আলাইহিস্ সালাম’ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- ‘কিতাবুল মাগাযী’র ৬২ নং বাব (অধ্যায়)-এর শিরোনাম হচ্ছে :

(باب بعث علي بن ابى طالب عليه السلام و خالد بن وليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع)

বাবু বা’সে আলী ইবনে আবী তালিব আলাইহিস্ সালাম ওয়া খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ইলাল ইয়ামান কাবলা হাজ্জাতিল বিদা অর্থাৎ বিদায় হজের আগে

---

[১] বাহরানী, সাইয়েদ হাশিম, আল বুরহান, পৃ. ১৫ ও ১৭।

[২] ইসফাহানী, শেখ মুহাম্মাদ হুসাইন, মাজদুল বাইয়ান, পৃ. ৫৮-৬১।

ইয়েমেনে আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস্ সালাম এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে প্রেরণ সংক্রান্ত অধ্যায়), হাদিস নং ৪৩৪৯..

আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে : আমি বাররা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি : আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.) খালিদ ইবনে ওয়ালীদের সাথে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি (বাররা) বললেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর (খালিদ ইবনে ওয়ালীদ) স্থলে হযরত আলীকে প্রেরণ করলেন এবং যাবার সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে (আলী) বললেন : খালিদের সঙ্গীসাথিদেরকে আদেশ করবে, তাদের মধ্যে যারা তোমার সাথে যেতে চাইবে তারা যেন তোমার সাথে যায়। আর যারা (তোমার কাছ থেকে) চলে আসতে চাইবে তারা যেন চলে আসে। আর আমি (বাররা) তার (হযরত আলীর) সাথে থেকে যাই। বাররা বলেন : আমি কিছুসংখ্যক বা কয়েক আউন্স (স্বর্ণ বা রৌপ্য) গণীমত লাভ করেছিলাম। লক্ষণীয় যে, বুখারী 'কিতাবুল মাগাযী'র ৬২ নং অধ্যায়ের শিরোনামে আলী ইবনে আবি তালিবের নামের পরে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' ব্যবহার না করে 'আলাইহিস্ সালাম' এবং সাহাবী খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নামের পরে 'রাদিয়াল্লাহু আনহুমা' ব্যবহার করেছেন। (দ্র. সহীহ আল-বুখারী, পৃ. ১০৬০, প্রথম সংস্করণ, ২০০৮, দারুল ফিক্র, বৈরুত, লেবানন কর্তৃক মুদ্রিত)

'কিতাবু ফাযাইলিস্ সাহাবা' (সাহাবাদের ফযীলত সংক্রান্ত কিতাব)-এর ৪১তম অধ্যায় : (باب مناقب قرابة رسول الله (ص) و منقبة قاطمة عليها السلام بنت النبي) 'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটাত্মীয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা আলাইহাস্ সালাম-এর মানাকেব (ফযীলত) সংক্রান্ত অধ্যায়' (দ্র. সহীস আল-বুখারী, পৃ. ৯০৯, ৯১৯, ১০৩৬, হাদিস নং-৪২৪০ ও ৪১৪১) লক্ষণীয় যে, বুখারী হযরত ফাতেমার নাম উল্লেখ করার পরে 'রাদিয়াল্লাহু আনহা' না বলে 'আলাইহাস্ সালাম' উল্লেখ করেছেন।

'কিতাবুল খুমুস'-এর খুম্স ফরয হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়ের (১ নং অধ্যায়) প্রথম হাদিসে (নং-৩০৯১) যুহরী থেকে বর্ণিত : আমাকে আলী ইবনুল হুসাইন বলেছেন : 'হুসাইন ইবনে আলী আলাইহিমাস্ সালাম আমাকে জানিয়েছেন যে, আলী বলেছেন : ... (দ্র. সহীহ আল-বুখারী, পৃ. ৭৫৫) লক্ষণীয় যে, ইমাম বুখারী হাদিসটির সনদে হুসাইন ইবনে আলী উল্লেখ করার পরে 'রাদিয়াল্লাহু আনহুমা' না বলে 'আলাইহিমাস্

সালাম' (তাঁদের দুজনের ওপর সালাম) উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এ গ্রন্থের অন্যান্য স্থানে হযরত আলী, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন এবং হযরত ফাতেমার নাম উল্লেখ করার পরে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' বা 'রাদিয়াল্লাহু আনহা'ও উল্লেখ করেছেন। অতএব, ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের ক্ষেত্রে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু'-এর পরিবর্তে 'আলাইহিস্ সালাম' ব্যবহার করা যায় এবং তা বৈধ (জায়েয)।

ইমাম তিরমিযীও স্বীয় গ্রন্থ 'আল-জামে আস-সহীহ সুনান আত-তিরমিযী'তে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ক্ষেত্রে 'আলাইহিমাস্ সালাম' عليهما السلام (তাঁদের দু'জনের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) এবং হযরত ফাতেমার ক্ষেত্রে 'আলাইহাস্ সালাম' عليها السلام (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) ব্যবহার করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থের 'কিতাবুল মানাকিব' (ফযীলত সংক্রান্ত কিতাব)-এর ৩১তম অধ্যায়ের শিরোনাম এভাবে লিখেছেন : 'মানাকিবুল হাসান ওয়াল হুসাইন আলাইহিমাস্ সালাম' (مناقب الحسن و الحسين عليهما السلام) অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন আলাইহিমাস্ সালামের মানাকিব ও ফাযায়েল (দ্র. সহীহ আত-তিরমিযী, পৃ. ৯৮৮, প্রথম সংস্করণ, দার ইহয়াইত তুরাস আল-আরাবি, বৈরুত, লেবানন)। ইমাম তিরমিযী 'কিতাবুল মানাকিব' এর ৬১তম অধ্যায়ের শিরোনাম এভাবে করেছেন : 'ফাযলু ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিমা ওয়াসাল্লাম' (فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليهما و سلّم) অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (মহান আল্লাহ তাঁদের দু'জনের ওপর দরুদ ও শান্তি বর্ষণ করুন)-এর ফযীলত সংক্রান্ত অধ্যায় (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৬)।

সুতরাং উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আহলে সুন্নাহর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস (হাদিসশাস্ত্রবিদ) ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযীর দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইত : হযরত আলী, ফাতেমা, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন-এর মুবারক নাম উচ্চারণ করার পর 'আলাইহিস্ সালাম', 'আলাইহাস্ সালাম', 'আলাইহিমাস্ সালাম', 'আলাইহিমুস্ সালাম', সাল্লাল্লাহু আলাইহিমা ওয়া সাল্লাম' অথবা 'সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লাম' বলা জায়েয এবং এতে কোন আপত্তি নেই। আর সেই সাথে একমাত্র নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আর কোন বুযুর্গ, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইত-এর ক্ষেত্রে 'আলাইহিস্

সালাম’ বলা যাবে না– এ বিষয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আকিদ-বিশ্বাসও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়ে যায়।

অনুবাদ : আনোয়ারুল কবীর

মহানবী (সা.)-এর নির্ভুলতার দাবি ও খেজুর গাছের পরাগায়নের হাদিস

এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবির

ইসলামে মহানবী (সা.)-এর নিষ্পাপতা ও নির্ভুলতার বিষয়টি ইসলামের শিক্ষা ও বাণীর ওপর ব্যাপক ও গভীর প্রভাব রাখে। ইসলামের অনুসারীদের একাংশ মহানবী (সা.)-এর নিরঙ্কুশ নির্ভুলতায় বিশ্বাসী এবং তাঁর এ নির্ভুলতার বিষয়টিকে নিছক শরীয়তের বিধিবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে না। এক্ষেত্রে মুসলমানদের বড় অংশটি কোন কোন হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত একটি হাদিসের (খেজুরের পরাগায়ন সম্পর্কে রাসূলের অজ্ঞতা) ভিত্তিতে মহানবীর নির্ভুলতার বিষয়টিকে ও এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের সঠিকতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে এবং তাঁর জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনাকে অপরিহার্য জ্ঞান করেছে। এ প্রবন্ধে আমরা পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ এবং বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে রেওয়ায়েতটির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে রাসূল (সা.)-এর শিক্ষায় ভুলের সম্ভাবনার বিষয়টিকে যাচাই এবং তাঁর বাণী ও কর্মের নির্ভুলতার সীমা নির্ধারণ করব।

মহানবী (সা.) কি নির্ভুল?

পবিত্র কোরআন মহানবী (সা.)-এর জ্ঞানগত ও চারিত্রিক মর্যাদাকে সমুন্নতরূপে উপস্থাপন করেছে। মহান আল্লাহ রাসূল (সা.) যে সকল সময় ও সকল অবস্থায় 'সিরাতুল মুস্তাকিম' বা সরল সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন তার নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন :

إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ

‘নিশ্চয় তুমি সরল পথের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) আছ।’ (সূরা যুখরূফ : ৪৩)

যদি রাসূল (সা.) কোন একটি ক্ষেত্রে অথবা কোন এক মুহূর্তে ভুল করেন তবে সে মুহূর্তে আর ‘সিরাতুল মুস্তাকিম’ এর ওপর থাকবেন না। উপরিউক্ত আয়াতে তাঁর ক্ষেত্রে এরূপ ভুলের সম্ভাবনাকেই নাকচ করা হয়েছে।

কখনই আল্লাহ কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই রাসূল (সা.)-এর সমগ্র জীবনকে মানবজাতির জন্য সকল (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক) ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন :

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ
وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

‘নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে (অনুসরণীয়) উত্তম আদর্শ রয়েছে, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।’ (সূরা আহযাব : ২১)

এ আয়াতের ভিত্তিতেও বলা যায়, তিনি কোন ক্ষেত্রে ভুল করলে সেক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ মানুষকে ভুলে পতিত করবে। তখন আর তিনি আদর্শ থাকবেন না। আয়াতে তাঁর বিষয়ে এমন ঘটার সম্ভাবনা নেই বলেই তাঁকে নিঃশর্তভাবে আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে।

কোরআনে রাসূল (সা.)-কে সত্য থেকে বিচ্যুত করার জন্য কাফেরদের সর্বাত্মক চেষ্টার বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন :

وَإِن كَادُوا۟ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ ۖ وَإِذًا
لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

আমরা তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ (ওহী অনুযায়ী চলার যে নির্দেশ দান) করেছি তারা তা হতে তোমাকে বিচ্যুত করার নিকটবর্তী হয়েছিল যাতে তুমি তার (প্রত্যাদেশের) পরিবর্তে (তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে) অন্য কিছুকে আমাদের ওপর মিথ্যা আরোপ কর এবং তাহলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। আমরা যদি তোমাকে (নিষ্পাপত্বের বৈশিষ্ট্য দানের মাধ্যমে) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না রাখতাম, তবে নিঃসন্দেহে তুমি তাদের দিকে সামান্য কিছু ঝুঁকে পড়ার নিকটবর্তী হতে। (সূরা বনি ইসরাইল : ৭৩-৭৪)

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে ওহী মোতাবেক কাজ করার ক্ষেত্রে রাসূলের অবিচলতার মাত্রা তুলে ধরা হযেছে। কারণ, আয়াতে চারটি পর্যায়ের উল্লেখ রয়েছে যা বাহ্যিক কর্মজগতেই শুধু নয়, মনোজগতেও তাঁর জন্য তা ঘটা অসম্ভব গণ্য করা হয়েছে। যথা :

১. ركون বা ঝোঁকা

২. ركون شَيْ কিছু ঝোঁকা

৩. ركون شَيْ قَلِيل সামান্য কিছু (ইষৎ বা অতি সামান্য) ঝোঁকা

৪. كِدتَّ تَرْكَنُ شَيْئاً قَلِيلاً বা সামান্য কিছু (ইষৎ) ঝোঁকার নিকটবর্তী হওয়া

আয়াতে আল্লাহ তাঁর থেকে মানসিকভাবেও কোরআনের নির্দেশের পরিপন্থী কোন কর্মের দিকে ঝুঁকে পড়া বা কিছুটা ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনাকেই শুধু বাতিল করেন নি; বরং সামান্য কিছু (অতি সামান্য) ঝোঁকার নিকটবর্তী হওয়াকেও নাকচ করেছেন। অর্থাৎ ঐশী পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছেন যে, কোন ক্ষেত্রে ও কোন অবস্থাতেই তাঁর মুখ থেকে কোরআন সমর্থন করে না এমন কোন কথা বের হওয়া ও তাঁর দ্বারা ঐরূপ কোন কর্ম সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব।

কেউ কেউ নিম্নোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-এর নির্ভুলতার বিষয়টি প্রমাণ করতে চেয়েছেন :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿٥﴾

‘এবং সে প্রবৃত্তির বশে (মনগড়া) কোন কথা বলে না, এতো কেবল প্রত্যাদেশ (ওহী), যা (তার প্রতি) প্রত্যাদেশ করা হয়, তাকে মহাশক্তিধর (আল্লাহ) শিক্ষাদান করেন।’ (সূরা নাজ্‌ম : ৩-৫)

যেহেতু আয়াতটিতে শুধু রাসূল (সা.)-এর নিজের থেকে বা প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলার সম্ভাবনাকেই নাকচ করা হয় নি; বরং সেই সাথে তাঁর প্রতিটি কথাকে ‘ওহী’ বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোরআন ও তাঁর অন্যান্য কথার মধ্যে পার্থক্য করা হয় নি অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তিনি প্রবৃত্তির বশে কথা বলেন না। আর এক মহাশক্তিধর শিক্ষক তাঁকে শিক্ষা দেয়াকে তাঁর সকল কথা ওহী হওয়ার যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আয়াতটিতে যদিও শুধু তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী এরূপ বৈশিষ্ট্যের বলা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আয়াতটি সূরা ক্বাফ-এর নিম্নোক্ত আয়াতের ন্যায় যেখানে মানুষের সকল কথা ফেরেশতারা লিখে রাখেন বলা হয়েছে; কিন্তু শুধু কথা উদ্দেশ্য নয়; বরং সকল কর্ম ও আচরণকে তা অন্তর্ভুক্ত করে : مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ অর্থাৎ সে যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তার নিকট একজন প্রহরী (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) সদাপ্রস্তুত থাকে। (সূরা ক্বাফ : ১৮) নিঃসন্দেহে ফেরেশতাগণ শুধু ব্যক্তির কথাকে লিপিবদ্ধ করেন না, তার সকল কর্মকে সংরক্ষণ করেন। তাই وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّ اَوَحْيٌ يُوحَىٰ –আয়াতে নিঃশর্তভাবে রাসূল (সা.)-এর সকল বাণী ও কর্ম ওহী উৎসারিত বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

অন্য যে আয়াতটিকে রাসূল (সা.)-এর নির্ভুলতার দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা যায় তা হলো সূরা তূরের ৪৮ আয়াত যেখানে আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন : وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ‘তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুম ও বিধানের (প্রচার ও বাস্তবায়নের) ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ কর। কেননা, তুমি আমাদের (ঐশী) তত্ত্বাবধানে রয়েছ।’– এ আয়াতেও আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাঁর বাণী–যা কোরআন ও সুন্নাহর সমম্বয় এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে–প্রচার ও বাস্তায়নের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার পরিচয় দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি যেহেতু তাঁর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন বলা হয়েছে, সেহেতু কখনও ভুল করতে পারেন না।

মহানবীর নির্ভুলতার উৎস ও কারণ

কোন মানুষই সত্তাগতভাবে নির্ভুল ও মাসুম নয়। যদি কারো মধ্যে নির্ভুলতার বৈশিষ্ট্য থাকে নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ প্রদত্ত। একারণেই মহামহিম আল্লাহ যখন তাঁর নবীকে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন এ বিষয়টিকে স্বীয় রহমত ও করুণার ফলশ্রুতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكَ وَرَحۡمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٞ مِّنۡهُمۡ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ
إِلَّآ أَنفُسَهُمۡۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيۡءٖۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُۚ وَكَانَ فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكَ عَظِيمٗا ﴿١١٣﴾

‘(হে রাসূল!) যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর করুণা না থাকত, তবে (মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতকদের) একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করার দৃঢ় সংকল্প করেছিল; অথচ তারা কেবল নিজেদেরই পথভ্রষ্ট করছে এবং তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবং আল্লাহ তো (দয়া করে) তোমার ওপর নিজ কিতাব (গ্রন্থ) ও প্রজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) অবতীর্ণ করেছেন এবং যা তুমি জানতে সক্ষম ছিলে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর তোমার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ আছে।’ (সূরা নিসা : ১১৩) আয়াতে আল্লাহ চক্রান্তকারীদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও যে রাসূল (সা.)-কে বিচলিত ও তাঁর মর্যাদাকর অবস্থানের কোন ক্ষতি করতে পারে নি তা উল্লেখ করে বলেছেন : وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ‘তারা কেবল নিজেদেরই পথভ্রষ্ট করছে এবং তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আয়াতটিতে মহান আল্লাহ মহানবী (সা.)-কে এমন তিন ধরনের (কিতাব, হিকমত এবং নিজের প্রচেষ্টায় অনর্জনীয়) জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন বলেছেন যে জ্ঞানের কারণে তিনি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভুল করেন না।

উল্লিখিত আয়াতে ‘কিতাব’ বলতে শরীয়তের বিধিবিধান যা মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ নিরসনের জন্য ওহীরূপে প্রেরিত হয়েছে। যেমনটি সূরা বাকারার ২১৩ আয়াতে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে : ‘(প্রথমে) সমুদয় মানুষ একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, পরে (পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলো), তখন আল্লাহ (মুক্তির) সুসংবাদদাতা এবং

(শাস্তির) সতর্ককারীরূপে নবিগণকে প্রেরণ করলেন এবং তাদের সাথে সত্যের প্রতি আহ্বানকারী কিতাব (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করলেন; যাতে তার (গ্রন্থ) দ্বারা যেসব ব্যাপারে (মানুষ) মতবিরোধ করেছিল, মীমাংসা করে দেয়।'

আর 'হিকমত' বলতে ওহী বর্ণিত এমন ঐশী জ্ঞান যা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর তা বোঝানো হয়েছে। আর আয়াতে 'যা তুমি জানতে সক্ষম ছিলে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন' বলতে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ কোরআন ও হিকমত ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞান উদ্দিষ্ট হয়েছে যা তিনি ইলহামের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ থেকে লাভ করতেন। এ জ্ঞানটি কখনই সাধারণ মানুষের জন্য অর্জনীয়-যা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হস্তগত করার যোগ্য-নয়। সাধারণত এ জ্ঞানটি তিনি কোন বিবাদ মীমাংসা এবং কোন ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নেয়ার সময় ব্যবহার করতেন। কেননা, বিবাদ মীমাংসার জন্য শুধু কোন বিষয়ে কী বিধান জারি হবে তা জানা যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি সত্যপক্ষ ও মিথ্যাপক্ষ, দাবির ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্ত, দোষী ও নির্দোষ কে, তা নির্ণয়ের যোগ্যতা থাকতে হবে।

এ ঐশীপ্রদত্ত জ্ঞানটিই হলো তাঁর নির্ভুলতার রক্ষাকবচ। অর্জনীয় বিভিন্ন জ্ঞান যেমনভাবে প্রবৃত্তির কামনা, ক্রোধ এবং অলীক ধারণা ও কল্পনার বশবর্তী হয় তা এমন নয়। বরং এ জ্ঞানটিই তাঁকে এগুলো থেকে রক্ষা করে। যে অতীন্দ্রিয় সত্তার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ জ্ঞানটি লাভ করতেন পবিত্র কোরআনে তাকে 'রূহ' বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে : 'এরূপে আমরা আমাদের নির্দেশ (এর জগৎ) থেকে তোমার প্রতি রূহ প্রেরণ করেছি; তুমি নিজের থেকে অবগত (জানতে সক্ষম) ছিলে না, গ্রন্থ কী এবং ঈমান কী?' (সূরা শূরা : ৫২)

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ
ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ ﴿٧٣﴾

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রূহকে রাসূলের জন্য শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেমনভাবে সূরা আম্বিয়ার ৭৩ আয়াতে আল্লাহর মনোনীত ইমামদের প্রতি উত্তম কর্ম ওহী হতো (وَ اَوْحَيْنا اِلَيهم فِعلَ الْخَيْرٰتِ) বলা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয় নি যে, وَ اَوْحَيْنا اِلَيهِم ان يفعل الْخَيْرٰتِ (অর্থাৎ তাদের প্রতি ওহী করেছিলাম যেন তারা উত্তম কর্মসমূহ সম্পাদন করে) বরং বলা হয়েছে : তাদের প্রতি

উত্তম কর্মসমূহ ওহী করেছি। এ দুই উক্তির মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। কারণ, প্রথমটি থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর মনোনীত ইমামরা যা করেন তা-ই কল্যাণ অর্থাৎ তাঁদের থেকে কল্যাণ ব্যতীত কিছুই উৎসারিত হয় না এজন্য যে, তাঁদের কর্ম ঐশীভাবে সমর্থিত। অন্যভাবে বলা যায়, আয়াতটিতে আল্লাহ তাঁদের থেকে সম্পাদিত কর্ম ওহী মোতাবেক হতো বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন বা তাঁদের কর্ম যে পূর্ণরূপেই শরীয়ত-সমর্থিত ওহী দ্বারা তা ঘোষণা করেছেন। এজন্যই আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে তাঁরা যে পূর্ব থেকেই তাঁর ইবাদতকারী ছিলেন ও তাঁদের ওপর আরোপিত শরীয়তের নির্দেশ পালন করতেন তার প্রতি ইশারা করে বলেছেন : (كانوا لنا عابدين) ‘তারা কেবল আমাদেরই ইবাদতকারী ছিল।’ (আলমিযান, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসাইন তাবাতাবায়ী, আলোচ্য আয়াতের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

সুতরাং এ আয়াতে যে ওহীর কথা বলা হয়েছে তা শরীয়ত পালনের নির্দেশ দিয়ে নয়; বরং এখানে ওহী তাঁদের উত্তম কর্মের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং এ কারণেই সবসময় তাঁদের থেকে উত্তম কর্ম উৎসারিত হয় তা বলা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্য ও উক্তি (وَ اَوْحَيْنا اِلَيهِم انى فعل الْخَيْرٰتِ অর্থাৎ তাঁদের প্রতি ওহী করেছিলাম যেন উত্তম কর্ম সম্পাদন করে) থেকে বোঝা যায় যে, তাঁদের প্রতি উত্তম কর্ম সম্পাদনের ওহী হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তাঁরা তা সম্পাদন করেছেন কিনা তা উহ্য রয়েছে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও শামিল যে, তাদের প্রতিও উত্তম কর্মের আদেশ পৌঁছেছে– এখন তারা সম্পাদন করুক বা না করুক। তাই আল্লাহর মনোনীত ইমামদের সাথে সাধারণ মানুষের পার্থক্য নির্দেশ করতেই বলা হয়েছে যে, তাঁরা পবিত্র আত্মা বা রূহুল কুদ্স দ্বারা সমর্থিত যা তাঁদের অন্তরের মধ্য থেকে উত্তম কর্ম সম্পাদনের আহ্বান জানায় ও তাঁদেরকে সেদিকে পরিচালিত করে। এই পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহ থেকে বাতেনিভাবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হন। তা-ই তাঁদেরকে আল্লাহর থেকে উদাসীন হওয়া থেকে বিরত রাখে। (আলমিযান, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসাইন তাবাতাবায়ী, আলোচ্য আয়াতের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

এজন্যই আল্লাহ হেদায়াতের সকল দিক ও ক্ষেত্রে তাঁর নবীর নিরঙ্কুশ সঠিকতার গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন :

وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

‘নিঃসন্দেহে তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর।’ (সূরা শূরা : ৫২)

নৈতিকভাবেও রাসূল (সা.) এমন এক সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন «وَإِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِيمٍ» (সূরা কালাম : ৪) যে, স্বয়ং আল্লাহ তাঁর জীবনের ওপর কসম করেছেন : لَعَمْرُكَ। (সূরা হিজ্‌র : ৭২)

এরূপ মহান মর্যাদার কারণেই আল্লাহ স্বীয় নামের পাশে অসংখ্যবার তাঁর নবীর উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য (সূরা নিসা : ৮০) এবং তাঁর নির্দেশের বিরোধিতাকে নিজের বিরোধিতা বলে ঘোষণা করেছেন। (সূরা আহযাব : ৩৬)

এছাড়া অনেক আয়াতে তিনি তাঁর আনুগত্যের পাশাপাশি তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে নিঃশর্তভাবে ফরয করেছেন।[১] কখনই আল্লাহ তা‘আলা ভুল-ভ্রান্তির শিকার হতে পারে এবং তাঁর নির্দেশের পরিপন্থী কোন হুকুম–তা যে কোন বিষয়েই হোক–দিতে পারে এমন ব্যক্তির নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ দিতে পারেন না। কারণ, সেক্ষেত্রে তাঁর বান্দারা পাপে পতিত হবে এবং আল্লাহর এ উদ্দেশ্য যে, বান্দারা পুণ্যকর্মের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করবে ও তাদের বিকাশ ও পূর্ণতায় পৌঁছবে, সে লক্ষ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বরং এ নবীর নিঃশর্ত অনুসরণ যেহেতু তাঁর বান্দাদের অবধারিতভাবে তাঁর নৈকট্য দান করে সেহেতু তিনি তাঁর অনুসরণকে তাঁর প্রতি ভালোবাসার দাবি প্রমাণের অনিবার্য শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

তুমি বল : ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন।’ (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কর্ম ও আচরণ আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন বৈ নয়। যেখানে আল্লাহ মুমিনদের তাদের পারস্পরিক মতবিরোধের বিষয়ে তাঁর রাসূলের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সেখানেও তাঁর

---

[১] আলে ইমরান : ৩২ ও ১৩২; মা’য়েদা : ৯২; আনফাল : ১,২০ ও ৪৬; নূর : ৫৪; মুহাম্মাদ : ৩৩; মুজাদিলা : ১৩ এবং তাগাবুন : ১২।

মীমাংসাকে নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদেশ জারি করেছেন ও মন থেকে তা গ্রহণ না করাকে ঈমানহীনতার প্রকাশ বলে গণ্য করেছেন। (সূরা নিসা : ৬৫)

এ বিষয়গুলো তাঁর নির্ভুলতার সাক্ষ্য হওয়া ছাড়াও আল্লাহর নিকট তাঁর মহান মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

পরিশেষে দ্বীনের জ্ঞানের বিষয়ে আল্লাহ তাঁকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে বলেছেন :

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ

রাসূল (সা.) যা কিছু তোমাদের জন্য এনেছেন (নির্দ্বিধায়) তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশ্‌র : ৭)

এ আয়াতের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) যা কিছু বলবেন, করবেন এবং তাঁর থেকে প্রকাশিত হবে, তা নির্ভুল ও কোরআনের আয়াতের মতোই প্রামাণ্য। আর এ নির্ভুলতার কারণেই তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীনের অনেক বিষয়ে রাসূলকে বিধান প্রণয়নের অনুমতি দান করা হয়েছে।[১] রাসূল (সা.) কর্তৃক যোহর, আসর ও এশার দু'রাকআত ফরয নামাযের সাথে অতিরিক্ত দুই রাকআত ও মাগরিবের নামাযের সাথে অতিরিক্ত এক রাকআত নামায সংযোজন এ অনুমতির পরিপ্রেক্ষিতেই ছিল। যেহেতু তাঁর এ সিদ্ধান্ত মহান আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয়েছে সেহেতু তিনিই তা সমর্থন করেছেন। (কুলাইনী, উসূলে কাফি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮৮, হাদিস ৩৬৬৯)

---

[১] মহান আল্লাহ যখন কোন নবিকে বিধান প্রণয়নের অনুমতি দেন অবশ্যই তাকে বিধানসমূহ প্রণয়নের পেছনে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং যে কল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তা প্রণীত হবে সেসম্পর্কে তাকে সম্যক জ্ঞান দান করেন। এ কারণে তারা স্বেচ্ছাচার ও প্রবৃত্তির বশে কোন বিধি প্রণয়ন করেন না। তাই নবিগণ এবং আল্লাহ মনোনীত তাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীতঅন্য কারো এমন করার অনুমতি নেই। সূরা নাহলের ১১৬ আয়াতের ভিত্তিতে কেউ এরূপ করলে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপের অপরাধে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে।

পূর্ববর্তী নবীদের কারো কারো ক্ষেত্রে আল্লাহ এরূপ অনুমতি দিয়েছেন। যেমন, হযরত ইয়াকুব (আ.) যা নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, আল্লাহ বনি ইসরাইলের জন্যও তা হারাম ঘোষণা করে বলেছেন :

كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ ۗ

‘তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাইল (ইয়াকুব) যা কিছু নিজের ওপর নিষিদ্ধ করে নিয়েছিল সেসব ব্যতীত বনি ইসরাইলের জন্য সব খাদ্য বৈধ ছিল।’ (সূরা আলে ইমরান : ৯৩)

নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর নিকট হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদার কারণেই এরূপ করা হয়েছিল। মহানবী (সা.) মহাস্রষ্টার নিকট বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদার অধিকারী যার ঘোষণা পবিত্র কোরআনে তিনি এভাবে দিয়েছেন :

عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

‘অচিরেই তোমার প্রতিপালক (এরূপে) তোমাকে বিশেষ প্রশংসিত (মর্যাদার) স্থানে পৌঁছে দেবেন।’ (বনি ইসরাইল : ৭৯)

مَّحْمُود বা প্রশংসিত হওয়া মহান আল্লাহর একটি বিশেষ গুণ। কারণ, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তাঁরই প্রশংসা করে। তাঁর রাসূলের (সা.) প্রতিও তিনি এতটা সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, তিনি চেয়েছেন তাঁর ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টির নিকট তাঁর এ প্রিয় বান্দাও প্রশংসিত গণ্য হোক। আর এ মর্যাদার স্থানকেই তিনি তাঁর গ্রন্থে ‘মাকামে মাহমুদ’ বা ‘প্রশংসিত (মর্যাদার) স্থান’ বলে উল্লেখ করেছেন। বন্দেগি ও দাসত্বের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছার বদৌলতেই তিনি আল্লাহর নিকট এ মর্যাদাকর অবস্থান লাভ করেছেন। আর তাঁর পথে মহানবী (সা.)-এর নির্ভুল কর্ম ও আচরণই তার এ দাসত্বকে পূর্ণতা দিয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহর নিরঙ্কুশ সন্তুষ্টির পাত্র করেছে। এজন্যই তিনি তাঁর এ হাবিব ও বন্ধুর সন্তুষ্টিকে নিজের জন্য আবশ্যিক ঘোষণা করে বলেছেন : ‘এবং তোমার প্রতিপালক তোমাকে এতটা দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।’ (সূরা আদ দুহা : ৫)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে মহানবী (সা.)-এর নিরঙ্কুশ নির্ভুলতা ও নিষ্পাপতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। দ্বীনি ও পার্থিব সকল বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের (কথা, কর্ম ও আচরণ) নির্ভুলতাও এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

খেজুর গাছের পরাগায়নের হাদিস

এ হাদিসটি যা حديث تأبير النخل বা حديث تلقيح النخل নামে প্রসিদ্ধ, আহলে সুন্নাতের বেশকিছু হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) মদীনায় প্রবেশ করে দেখলেন মদীনাবাসীরা পুরুষ খেজুর গাছের ফুলের গুচ্ছকে স্ত্রী গাছের ফুলের ওপর ঝাঁকায় যাতে এর রেণুগুলো স্ত্রী গাছের ফুলগুলোকে পরাগায়িত করে। এটা দেখে তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন এটা তারা না করে বরং বাতাসের মাধ্যমেই যেন পরাগায়ন সংঘটিত হতে দেয়। তখন বাগানমালিকরা তাঁর পরামর্শ মতো তা থেকে বিরত থাকল। কিছুদিন পর তারা দেখল গাছগুলোতে কোন খেজুর ধরে নি। ফলে তারা অর্থনৈতিক ক্ষতির শিকার হয়ে তাঁর নিকট অভিযোগ করল। তিনি এতে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন : ‘আমি পার্থিব বিষয়ে তোমাদের থেকে অধিক কিছু জানি না। যদি আমি পার্থিব বিষয়ে তাদের এমন পরামর্শ দেই যা তাদের উপকার সাধন করে তবে তারা যেন তা করে। কারণ, ঐ সম্পর্কে আমার এটা নিছক ধারণাপ্রসূত। তাই তা গুরুত্বের সাথে নিও না। কিন্তু যদি কোন কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে বলি তবে সে অনুযায়ী কাজ করো। কেননা, আমি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করি না।’ (আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২, হাদিস ১৪১২)

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হাদিসটিকে কিছুটা পার্থক্যসহ এভাবে বর্ণনা করেছেন : রাসূল (সা.) একদল লোকের মুখোমুখি হলেন যারা খেজুর গাছকে পরাগায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করত। তিনি তাঁর দৃষ্টিতে এ কাজটি অর্থহীন বলে তাদের জানাতে বললেন। তারা এটা জেনে এ কাজ থেকে বিরত থাকল। তারপর মহানবী (সা.) তাদের খবর দিলেন যে, যদি ঐকাজ উপকারী হয়, তবে তারা তা করতে পারে। কারণ, এ সম্পর্কে তাঁর মতটি একটি সম্ভাব্য ধারণামাত্র। হয়তো এতে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সংবাদ দেন, তা অনুসরণ করা ফরয ও অপরিহার্য। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, কিতাবুল ফাযাইল, বাবু উজুবিল ইমতিছাল, পৃ. ৯৭, হাদিস ৪৩৫৭)

এ হাদিসটিতে নবীর কথা অনুযায়ী খেজুর গাছে পরাগায়ন না করার পরিণতিতে কী ঘটেছে তা বলা হয় নি। কিন্তু ইবনে মাজাহ যে হাদিসটি হযরত আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, যখন লোকেরা রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ মতো পরাগায়নের কাজ থেকে বিরত থাকল তখন সব খেজুর গাছের ফল নষ্ট হয়ে গেল। তখন তিনি (সা.) বললেন : 'আমি যদি পার্থিব কোন বিষয়ে তোমাদেরকে কিছু বলি সেক্ষেত্রে তোমাদের স্বাধীনতা রয়েছে (তোমরা তা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করতে পার)। আর যদি দ্বীনের কোন বিষয়ে বলি, তবে তার দায়িত্বভার আমার ওপর বর্তাবে।' (ইবনে মাজাহ কাযভিনী, ২য় খণ্ড, বাবু তালকিহুন্নাখ্‌ল, হাদিস ২৪৬১, পৃ. ৮২৫)

হাদিসটির ওপর একটি পর্যালোচনা

এ হাদিসটিকে নবী করিম (সা.)-এর সুন্নাতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বিচারগত ও সামরিকসহ সকল বিভাগে তাঁর সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাকে অনির্ভরযোগ্য ও প্রশ্নের সম্মুখীন এবং ঐ সকল ক্ষেত্রে তাঁর বাণী ও কর্মকে অগ্রহণীয় করে ফেলে। এ হাদিস মূলত ইসলামকে আখেরাত ও নৈতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসের পথকে সুগম করে। ফলে খ্রিস্টীয় ঐ চিন্তাধারাকে সমর্থন দেয়া হয় যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কাজকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ কর আর সম্রাটের কাজকে সম্রাটের হাতে ছেড়ে দাও।

আহলে সুন্নাতের আলেমরা এ হাদিসগুলোকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করে ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে মুজতাহিদদের ব্যক্তিমত ও ইসতিহসান বা পছন্দজনিত সিদ্ধান্ত অবৈধ হলেও পার্থিব বিষয়ে সেগুলো বৈধ বলে ফতওয়া দিয়েছেন। যেমন, নাভাভী এ বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন : 'আলেমরা মহানবী (সা.)-এর কথার من رأيى -'আমার নিজস্ব মত থেকে' অংশের অর্থ দুনিয়া ও পার্থিব জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে, শরীয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে শরীয়তের বিষয়ে কিছু বলেন তা অবশ্যই পালনীয়। খেজুরের পরাগায়নের বিষয়টি শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছু নয়।' (নাভাভী, শারহে সহিহ মুসলিম, ১১তম খণ্ড, পৃ. ১১৬)

তাঁর এ বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় আমাদের হস্তগত হয় :

১. যে সকল বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর বাণী ও কর্মের সাথে ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিক্ষার সরাসরি সম্পর্ক নেই সেক্ষেত্রে তিনি ভুলের উর্ধ্বে নন এবং তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়।

২. তাঁর মতে পার্থিব বিষয়সমূহ অভিজ্ঞতালব্ধ একটি বিষয়, আর যেহেতু রাসূল (সা.)-এর এর দায়িত্ব ছিল আল্লাহর মারেফাত ও শরীয়তের বিধান সম্পর্কে জানা সেহেতু তিনি পার্থিব বিষয়ে ততটা আগ্রহী ছিলেন না এবং এক্ষেত্রে কোন অভিজ্ঞতা অর্জনেও সক্ষম হন নি।

আমরা এখন পবিত্র কোরআন, হাদিসশাস্ত্র, বুদ্ধিবৃত্তি ও ইতিহাসের আলোকে হাদিসটি নিয়ে পর্যালোচনা করব।

পবিত্র কোরআনের মানদণ্ডে খেজুরের পরাগায়নের হাদিস

পবিত্র কোরআন হলো ফুরকান ও সকল বিষয়ের সত্যাসত্য যাচাইয়ের ঐশী ও সর্বোৎকৃষ্ট মানদণ্ড। এ হাদিসটিকে যদি আমরা পবিত্র কোরআনের সামনে উপস্থাপন করি তাহলে দেখব যে, এ হাদিসের বিষয়বস্তুকে কোরআন সমর্থন করে না। কারণ, প্রথমত, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা সূরা রা'দের ৩ এবং সূরা ইয়াসিনের ৩৬ নং আয়াতে সকল ফল ও ফসলের পুং ও স্ত্রী ফুল অথবা পুং ও স্ত্রী বৃক্ষ রয়েছে বলে তাঁর নবীকে অবহিত করেছেন।[১] সুতরাং কিভাবে বলা যায় যে, তিনি খেজুর গাছের পুং ও স্ত্রী বৃক্ষ আছে তা জানতেন না ও সেগুলোকে চিনতেন না এবং তাদের ফুলের কার্যকারিতা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতেন না।

দ্বিতীয়ত, শুধু এ হাদিসের ভিত্তিতে (যদিও তা বিভিন্নসূত্রে বর্ণিত, কিন্তু ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু একটি) রাসূল (সা.)-এর বাণী ও কর্মকে পার্থিব ও অপার্থিব এবং ঐশী ও ইজতিহাদি এ দুই ভাগে ভাগ করা অন্যায় ও অযৌক্তিক। কেননা, এর সপক্ষে কোরআনের একটি দলিলও বিদ্যমান নেই। বরং পার্থিব ও অপার্থিব সকল বিষয়েই তিনি যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং সকল মুসলমান তা মেনে চলতে বাধ্য তার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন : 'এবং কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর এ

---

[১] মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি এ সমগ্র জোড়া সৃজন করেছেন, ভূমি যা উৎপন্ন করে তার মধ্য হতে এবং স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে। (ইয়াসিন : ৩৬) এবং তিনি প্রত্যেক ফলের (ও ফসলের) মধ্যে দুইটির এক জোড়া করে সুষ্টি করেছেন। (রা'দ : ৩)

অধিকার নেই যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা দান করেন তখন তারা তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে নিঃসন্দেহে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়েছে।' (সূরা আহযাব : ৩৬)

এর বিপরীতে তিনি যে সামাজিক ও রাজনৈতিকসহ কোন বিষয়েই মুসলমানদের কথা ও পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য নন, তার ওপর গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ ত'আলা বলেছেন :

'তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছে ; যদি সে অনেক বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে চলে, তবে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়বে।' (সূরা হুজুরাত : ৭)

উল্লেখ্য যে, এ আয়াতটি কোন কোন সাহাবী তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য তাঁর ওপর পীড়াপীড়ি করতে থাকলে অবতীর্ণ হয়। তাই এখানে মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যে কোন কাজের জন্য তাদের পরামর্শ চাইতে পারেন। তবে একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, তাদের দেয়া উপদেশ ও পরামর্শগুলো গ্রহণ করা ও বাস্তবায়ন করা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক। তিনি তো আল্লাহর দ্বারা পরিচালিত দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী এবং কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব তাঁরই। সকল ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও প্রশ্নাতীত। এখানে মনে রাখা আবশ্যক, রাসূল (সা.) শরীয়তের ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়ে কখনই কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন না। কারণ, এ বিষয় স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দেন। তাই তিনি কেবল সামাজিক, রাজনৈতিক ও বিধিবিধান কার্যকর করার পদ্ধতির বিষয়ে পরামর্শ করতেন। আর আল্লাহ এসব বিষয়েও তাঁর ওপর যেন সাহাবীরা নিজের মত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা না করেন সে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই পার্থিব বিষয়েও মুসলমানদের তাঁর নির্দেশের শতভাগ অনুগত হওয়া আবশ্যক। আর যেহেতু ইসলাম মানুষকে জীবনের পার্থিব ও অপার্থিব সবক্ষেত্রে হেদায়াত করতে চায় সেহেতু আল্লাহ কখনই তাঁর নবীকে পার্থিব বিষয়ে অজ্ঞ রাখতে পারেন না।[১]

---

১. মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াতে মহাকাশ, বিশ্বজগতের সৃষ্টি, গ্রহ-নক্ষত্র, কক্ষপথ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, মাছ ও বিভিন্ন সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং মানুষকে সেগুলো নিয়ে গভীর চিন্তা করতে বলেছেন। আর এ আয়াতগুলোর সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। নিঃসন্দেহে তিনি এ আয়াতগুলোর অর্থ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং আল্লাহর

বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, রাসূল (সা.) পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ে অন্য সকলের চেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। যেমন তিনি যে মহাসমরনায়ক ছিলেন– এ বিষয়টি অনেক প্রাচ্যবিদও স্বীকার করেছেন। তাই দেখা গেছে, যুদ্ধের ময়দানে যখনই মুসলমানরা রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ ভঙ্গ করেছে তখনই পরাজয়ের শিকার হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধে তারা আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ লঙ্ঘন করার কারণে পরাজয় বরণ করেছে। সূরা আলে ইমরানের ১৫২ আয়াতে আল্লাহ্ এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন :

‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ (ওহুদ যুদ্ধেও) নিজ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করেছিলেন, যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে (প্রথম আক্রমণে) তাদের নিধন করছিলে; (তাঁর এ সাহায্যের প্রতিশ্রতি ততক্ষণ বলবৎ ছিল) যতক্ষণ না তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করলে এবং (রাসূলের নির্দেশের ব্যাপারে) পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলে এবং তার অবাধ্যতা করলে।’

হুদাইবিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রেও এ কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়। কেননা, মহান আল্লাহ তাঁকে হুদায়বিয়ায় সন্ধি করার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু এ সন্ধির শর্তগুলো কী কী হবে তা তিনি তাঁর রাসূলকে বলে দেন নি। বরং এক্ষেত্রে রাসূল তাঁর প্রতিপক্ষের অনেক আপত্তিকর শর্তও মেনে নেন যা অনেক সাহাবীই প্রথমে মেনে নিতে পারেন নি। ফলে তাঁরা প্রতিবাদ করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে এ শর্তগুলো চরম অবমাননাকর মনে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর দিব্যদৃষ্টিতে এ সন্ধির সুদূরপ্রসারী বিস্ময়কর সুফল এবং এর ফলে ভবিষ্যতে কী কী ঘটতে পারে তা নিশ্চিতরূপে জানতেন। তাই তাঁদের প্রতিবাদে কোন কর্ণপাত করেন নি। আর এ ঘটনাটি মহানবী (সা.)-এর সকল বিষয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্তের অধিকারী হওয়ার প্রমাণ বহন করে এবং তিনি যে পার্থিব ক্ষেত্রেও সবার চেয়ে জ্ঞানী ছিলেন তা প্রমাণ করে।

তৃতীয়ত, হাদিসটিতে যে রাসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইসলামকে পার্থিব ও অপার্থিব দিকের বিভাজনে বিভক্ত করা হয়েছে তা বিষয়বস্তুগত দিক থেকেও পবিত্র কোরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থী। কেননা, কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় পার্থিব সকল বিষয়ে–যেমন : রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচার-আইন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক, বৈদেশিক সম্পর্ক ও নীতি...–মহানবী (সা.)-এর সরব পদচারণা ছিল।

সৃষ্টজগতের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ রাখতেন। রাসূল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠ সাহাবী ও শিষ্য আলী (আ.) মানুষসহ অনেক প্রাণী ও পতঙ্গের বিস্ময়কর সৃষ্টি নিয়ে ‘নাহজুল বালাগা’য় কথা বলেছেন।

কারণ, স্বয়ং কোরআন এ বিষয়সমূহে করণীয় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছে যার আওতায় এগুলোও শামিল হবে। অর্থাৎ কোরআন এগুলোকে ধর্মীয় বিষয় থেকে স্বতন্ত্র ও শরীয়ত-বহির্ভূত বলে গণ্য করে নি।

চতুর্থত, মহান আল্লাহ কোন বিষয়েই–পার্থিব বা পারলৌকিক–মুমিনদের রাসূল (সা.)-এর চেয়ে অগ্রগামী হতে নিষেধ করে বলেছেন : 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে তোমরা (কোন বিষয়ে) অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।' (সূরা হুজুরাত : ১)

এ আয়াতে মুমিনদের আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা সকল বিষয়ে–দ্বীনকে বোঝার ক্ষেত্রে হোক বা আদেশ-নিষেধের পরিপ্রেক্ষিতে হোক–দ্বিধাহীন ও নিঃশর্তভাবে মহানবী (সা.)-এর অনুগত থাকে।[১] বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা কী হবে তা পূর্ব থেকেই আঁচ করে সে অনুযায়ী কাজ না করে অথবা নিজেদের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার ওপর স্থান না দেয়। মহানবী (সা.) পার্থিব বিষয়ে ভুলের শিকার হলে আল্লাহ মুমিনদের সকল অবস্থায় তাঁর পশ্চাতে থাকার নির্দেশ দিতেন না।

পঞ্চমত, এ হাদিসটির বিষয়বস্তুকে মেনে নিলে নবুওয়াতের মিশনই নিষ্ফল হয়ে পড়বে। কারণ, নুওয়াতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে হেদায়াত করা। আর হেদায়াতের বিষয়টি সকল ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর নিঃশর্ত অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ বলছেন :

فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

---

[১] আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল থেকে জানা যায় দু'জন সাহাবী কোন এক গোত্রের দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করা হবে এবিষয়ে রাসূলের মত না শুনেই নিজেদের মত ব্যক্ত করে তাঁর সামনে বিবাদে লিপ্ত হলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, আয়াতটি নিতান্ত পার্থিব বিষয়ে রাসূলের অগ্রগামী না হওয়ার নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আয়াতটি পার্থিব বিষয়েও মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্তের সঠিকতার সাক্ষ্য দেয়।

সুতরাং তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর সেই রাসূল উম্মী নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর যে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাকে অনুসরণ কর যাতে তোমরা হেদায়াত (পথনির্দেশ) পাও।' (সূরা আ'রাফ : ১৫৮)

এ আয়াতে রাসূলের অনুসরণের নির্দেশটি আল্লাহ ও তাঁর সকল কর্ম ও বাণীর ওপর নবীর বিশ্বাস ও আস্থার কারণে দেয়া হয়েছে। অথচ এ হাদিসে দেখা যায়, রাসূল (সা.) আল্লাহর প্রাকৃতিক সুন্নাতের (মানুষকে খেজুর গাছের পরাগায়ন ঘটাতে হবে) ওপর আস্থা রাখেন না; বরং একে ভুল গণ্য করে বলেন : ما اظن ذالک یغنی شیأ ('আমি ধারণা করি না যে, এতে কোন লাভ আছে)। তাহলে তিনি কিভাবে হেদায়াতের ক্ষেত্রে মানুষের বিশ্বাসের পাত্র হবেন। (জাফর সুবহানী, হি. ১৪১৯, ইলাহিয়াত আলা হুদাল কিতাব ওয়স সুন্নাহ ওয়াল আক্ল, পৃ. ১৫৪)

মোটকথা, অকাট্য সূত্রে বর্ণিত পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতের বিপরীতে ভ্রান্তির সম্ভাবনাযুক্ত কোন হাদিসের (যা রাসূল থেকে বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত) বিষয়বস্তুর কোন মূল্য নেই।

হাদিসশাস্ত্রের মানদণ্ডে হাদিসটির পর্যালোচনা

এখন আমরা হাদিসটির সনদ এবং মাত্ন বা টেক্সট নিয়ে আলোচনা করব।

ক. হাদিসটির সনদের পর্যালোচনা

সনদের দৃষ্টিতে হাদিসটির বড় ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। কারণ, হাদিসটির সনদে ইকরামা, আফফান, হাম্মাদ ইবনে সালমাহ, হিশাম ইবনে উরওয়াহ, সাম্মাক ইবনে হার্ব এবং আবদুল্লাহ ইবনে মূসা রয়েছেন এবং বিভিন্ন রিজালশাস্ত্রবিদের দৃষ্টিতে তাঁরা ত্রুটিপূর্ণ বিবেচিত হয়েছেন। যেমন :

ইমাম নাসাঈ ইকরামাকে যাইফ, আকিলি তাঁকে 'মুযতারিব' (হিফ্যের ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারণে যার বর্ণিত হাদিসের সনদ ও মাত্নে অসঙ্গতি রয়েছে) হাদিস বর্ণনাকারী এবং আহমাদ ইবনে হাকিম তাঁকে 'বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নয়' বলেছেন। (ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১০)

আফফান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ নামে দু'ব্যক্তি রয়েছে, তারা উভয়ই মাজহুল বা অজ্ঞাত (যাকে কেউ বিশ্বস্ত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে জানা যায় নি)। (আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪) মিযযি সুলায়মান ইবনে হার্‌ব থেকে তার সম্পর্কে বলেছেন যে, সে তার কবরে এমন অবস্থায় প্রবেশ করেছে যে শো'বার ওপর মিথ্যা হাদিস আরোপ করার কারণে অনুশোচিত ছিল। (মিযযি, তাহযিবুল কামাল, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৬৯ ও ১৭৩)

হিশাম ইবনে উরওয়াহও বেপরোয়াভাবে হাদিস বর্ণনা করার কারণে ইরাকি হাদিসবিদদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। যাহাবি তার সম্পর্কে বলেছেন : 'সে ইরাকে প্রবেশ করার পর ব্যাপকহারে হাদিস বর্ণনা করার কারণে তারা তাকে অগ্রহণযোগ্য গণ্য করেছে।' (যাহাবি, শামসুদ্দিন, তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪ ও সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩০তম খণ্ড, পৃ. ২৩৯)

হাম্মাদ ইবনে সালমাহ বৃদ্ধাবস্থায় হিফ্‌যের দুর্বলতার কারণে যাঈফ বলে গণ্য হয়েছে। ফলে তার থেকে বর্ণিত হাদিসের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। বিশেষত সে বিশ্বস্ত রাবীদের বিপরীতে কোন হাদিস বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। একারণে বুখারী তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেন নি। (মিযযি, তাহযবিুল কামাল, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৬৯ ও ১৭৩)

আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও মাদিনীর দৃষ্টিতে এ হাদিসের অপর রাবি সাম্মাক ইবনে হার্‌ব 'মুযতারিবুল হাদিস' অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদিসের মধ্যে সনদ ও মাত্‌নগত অসঙ্গতি রয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আম্মার মুসেলী তাকে 'গালি' বা অতিরঞ্জনকারী বলেছেন। (প্রাগুক্ত, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১১৯-১২০)

আবদুল্লাহ ইবনে মূসা সম্পর্কে আহমাদ ইবনে হাম্বাল বলেছেন : 'সে সঠিক হাদিসের সাথে মিথ্যা ও জাল হাদিস মিশ্রিত করত।' (মিযযি, তাহযবিুল কামাল, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১৬৮-১৬৯)

সুতরাং এ হাদিসের রাবীদের অনেকেই রিজালশাস্ত্রবিদদের দৃষ্টিতে 'যাঈফ' বলে গণ্য যা একে অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করে। তাই এ হাদিসের বিচারে মহানবী (সা.)-এর নির্ভুলতার বিষয়ে মন্তব্য করা কখনই সঠিক নয়।

খ. হাদিসের মাত্ন বা টেক্সটের পর্যালোচনা

হাদিসটির একটি বড় ত্রুটি হলো তা অন্যান্য হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কেননা, বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনামতে মহানবী (সা.) সকল অবস্থায়ই (ক্রোধ-সন্তুষ্টি, শোক-আনন্দ) সঠিক ও নির্ভুল কথা বলেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত হয়েছে : "আমি রাসূল (সা.) থেকে যা-ই শুনতাম তা লিখে রাখতাম। কিন্তু কুরাইশরা আমাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলল : 'তুমি কি যা কিছু রাসূল (সা.) থেকে শোন তা-ই লিখে রাখ? অথচ তিনি একজন মানুষ যে (কখনও) ক্রোধ এবং (কখনও) সন্তুষ্টির সময় কথা বলে (যা তাঁর ওপর প্রভাব ফেলে)।' এ কথা শুনে আমি লিখা থেকে বিরত হলাম এবং তাদের কথাটি রাসূলের নিকট বললাম। তিনি বললেন : 'লিখ। আমার জীবন যাঁর হাতে নিবদ্ধ তাঁর কসম, এখান (নিজের মুখের প্রতি ইশারা করে) থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই বের হয় না।" (সুনানে আবি দাউদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮, রাকাম ৩৬-৪৬; মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, বাকিউ মুসনাদিল আনসার, হাদিসু সাইয়্যেদাহ আয়েশাহ, পৃ. ৩৯৫)

তাছাড়া বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে এ সম্পর্কে যে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে তার মাত্ন বা মূলপাঠের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়। যার কোনটিতে বলা হয়েছে ما اظن ذالک يغنى شيأ (আমি ধারণা করি না যে, এতে কোন লাভ আছে), আবার কোনটিতে বলা হয়েছে لو لم تفعلوا لصلح (তোমরা যদি তা না কর, তাই উপযুক্ত); কোনটিতে বলা হয়েছে لو لم تفعلوا كان خيرا অর্থাৎ যদি তোমরা না কর তবে তা উত্তম; এ কথাগুলোর একটিতে তিনি বলছেন, 'আমার ধারণা এমন'। অন্য দুটিতে এমনভাবে কথা বলছেন যা থেকে বোঝা যায় পরাগায়নের কাজটি না করলে যে ভালো হবে এবং তা না করা যে উত্তম তিনি তা নিশ্চিত। তবে কি তিনি না জেনে একটি বিষয়ে নিশ্চিত সুরে কথা বলেছেন ও দাবি করছেন। তবে তো তিনি নাউজুবিল্লাহ মিথ্যা কথা বলেছেন।

হাদিসের শেষাংশের মধ্যেও মিল নেই। কোনটিতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ অর্থাৎ 'আমি তো মানুষ, আমি তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কিছু বললে তা গ্রহণ কর। আর যদি আমার মতে কিছু বলি তাহলে আমি কেবল মানুষ'; কোনটিতে এর পরিবর্তে বলা হয়েছে, إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ অর্থাৎ 'আমি তো শুধু

ধারণা করেছি, আমার ধারণার কারণে আমার সমালোচনা করো না'; কোনটিতে এ অতিরিক্ত অংশ সংযোজিত হয়েছে যে, أنتم أعلم بأمر دنياكم অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের দুনিয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জান'। এগুলোর মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করা হবে। বিশেষত إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ অর্থাৎ 'আমি তো শুধু ধারণা করেছি, আমার ধারণার কারণে আমার সমালোচনা করো না'– এ কথার মধ্যে মানুষের সামনে তাঁর অসহায়ত্ব ও ক্ষুদ্রতার বিষয়টি কতটা প্রকট তা লক্ষ্য করা যায়। এটা তাঁর নবুওয়াতের প্রতি একটি অবমাননা।

সুতরাং বর্ণিত হাদিসের পাঠ্য পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থীই শুধু নয়; বরং অন্য হাদিসসমূহ যাতে রাসূলকে নির্ভুল বলা হয়েছে সেগুলোর সাথেও সাংঘর্ষিক। তাছাড়া এগুলোর টেক্সট বা মাত্নের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। একটি ঘটনার বর্ণনায় এতটা পার্থক্য কখনই স্বাভাবিক নয়। তদুপরি কোন কোনটি থেকে তিনি নাউজুবিল্লাহ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হন, যা তাঁর মহান মর্যাদার সুস্পষ্ট অবমাননা।

বুদ্ধিবৃত্তির মানদণ্ডে হাদিসটির পর্যালোচনা

হাদিসটি বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী। কেননা, প্রথমত, যদি রাসূল পার্থিব কোন বিষয়ে ভুল করেন, তাহলে মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর থেকে কোরআন-বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়েও–এমনকি ঐশীভাবে বর্ণিত হলেও–তিনি তাতে ভুল করতে পারেন বলে সন্দেহ দেখা দিবে। ফলে (পরিমাণের দিক থেকে) দ্বীনের জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস অর্থাৎ সুন্নাত প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। কারণ,এ হাদিসের অর্থ হলো তাঁর বাণী ও কর্ম দু'ভাগে বিভক্ত : ব্যক্তিমত ও ধারণাভিত্তিক (ভুলের সম্ভাবনাযুক্ত) এবং ঐশী ও নির্ভুল। তাই রাসূলের সকল কথাকে–যার অধিকাংশই তাঁর তথাকথিত ইজতিহাদপ্রসূত–সূক্ষ্মভাবে যাচাই করে এ দুয়ের পার্থক্য নির্ণয় করে তারপর গ্রহণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তাঁর যে সুন্নাতের কথাই আসবে প্রথম প্রশ্ন দেখা দেবে তিনি এটা ব্যক্তিমতে ও ধারণার ভিত্তিতে বলেছেন ও করেছেন, না কি ঐশী নির্দেশে। তাই প্রতিমুহূর্তে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, তিনি কি সেটা নিজের পক্ষ থেকে বলছেন, না আল্লাহর পক্ষ থেকে? প্রতিটি ক্ষেত্রে এরূপ করা অসম্ভব। বিশেষত আকস্মিক কোন পরিস্থিতিতে–যেমন যুদ্ধের মধ্যে–তিনি ত্বরিত কোন নির্দেশ দিলে তাৎক্ষণিক তা বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক। না হলে ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনতে

পারে। আর তাঁর ওফাতের পর এটা–নিজের পক্ষ থেকে বলছেন, না আল্লাহর পক্ষ থেকে–নির্ণয় করা আরো অসম্ভব। পরিণতিতে তাঁর থেকে আসা কোন হাদিসের ওপরই নির্ভর করা যাবে না যতক্ষণ না সে হাদিসে এ অংশটি থাকবে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তা বলছেন। যেহেতু তাঁর সুন্নাতের বড় অংশটিই তাঁর কর্ম ও আচরণ–যা অন্যরা তাঁকে করতে দেখে বর্ণনা করেছেন–সেক্ষেত্রে আদৌ বলা সম্ভব না যে, কোনটি তিনি আল্লাহর নির্দেশে করেছেন এবং কোন্টি (উক্ত দাবি অনুযায়ী) নিজের ইজতিহাদি মতে। আর এটা সার্বিকভাবে তাঁর সুন্নাতের (বাণী, কর্ম, আচরণ) গ্রহণযোগ্যতা, প্রামাণ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করবে। সাইয়্যেদ জাফর মুরতাযা আমেলী এ বিষয়ে বলেন :

‘রাসূল (সা.) সার্বিভাবে সকল ক্ষেত্রে নির্ভুল ও নিষ্পাপ। তাই আমরা ঐ ব্যক্তিদের কথাকে সঠিক বলে মনে করি না যাঁরা বলেন যে, তিনি কেবল দ্বীনি বিষয়ের প্রচারের ক্ষেত্রে নির্ভুল, কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র ও বিভাগে নির্ভুল নন। বরং আমরা মনে করি, তিনি দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে যেমন নির্ভুল, তেমনি জীবনের সকল দিকেও নির্ভুল। কারণ, তাঁর জীবনের সকল পদক্ষেপ ও কর্ম তাঁর রেসালাতের (মিশনের) অন্তর্ভুক্ত। তাই আমরা তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিভাজিত ও খণ্ডিত করে বলি না যে, তিনি এদিক থেকে নির্ভুল, কিন্তু অমুক দিকে নির্ভুল নন। আমরা বলি, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি, অন্তঃকরণ, ভাবাবেগ, অনুভূতি, অনুধাবন ক্ষমতাসহ জীবনের সকল চিন্তা, কর্ম ও আচরণগত দিক নির্ভুলতার সার্বিক নীতির অধীন।’ (খালফিয়াতু মাসা’তিয যাহরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩)

দ্বিতীয়ত, এ হাদিসটি মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সাথেও সংগতিশীল নয়। কারণ, একজন সাধারণ সৎ ও বুদ্ধিমান মানুষও কখনও ধারণার বশবর্তী হয়ে যে বিষয়ে তার পারদর্শিতা নেই সে বিষয়ে অযাচিত মন্তব্য করে মানুষকে বিপদ ও ক্ষতির মুখে ফেলবে না। সেখানে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ যাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্র ও আদর্শের নিরঙ্কুশ প্রশংসা করেছেন, তাঁর পক্ষে কিভাবে এরূপ কর্ম করা সম্ভব। বিশেষত যখন তাঁকে যে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত জ্ঞান রাখেন না, তার অনুসরণ করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে বলা হয়েছে :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

‘যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার অনুসরণ কর না, কেননা, শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় এবং হৃদয়– তাদের প্রত্যেকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।’ (সূরা বনি ইসরাইল : ৩৬)

সহীহ মুসলিমের বর্ণনাটি এ সমস্যাটিকে আরো প্রকট করে। কেননা, তিনি তাদের প্রশ্ন করেছিলেন কেন তারা এটা করে, তারা জবাবে বলেছিল : يلقحونه و يجعلون الذكر فى الانثى فتلقح ‘তারা সেটার পরাগায়ন করছে এবং পুরুষকে (গাছের রেনুকে) স্ত্রী গাছের ওপর ঝারছে যাতে নিষিক্ত হয়।’ তিনি এটা শোনার পরও তাদের কথার তোয়াক্কা না করে এ কাজে তাদেরকে নিষেধ করেন।

তৃতীয়ত, হাদিসটির বর্ণনা মতে অন্যরা রাসূলের থেকে পার্থিব বিষয়ে অধিকতর অবগত যার অর্থ হলো রাসূল (সা.) যদি এ বিষয়ে তথাকথিত ইজতিহাদের ভিত্তিতে কিছু বলেন তা নির্ভরযোগ্য নয়। তবে কেন বুখারী তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে ‘কিতাবুত তিব’ শিরোনামে তাঁর থেকে চিকিৎসা বিষয়ে শতাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন? (সহীহ বুখারী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪) যেহেতু চিকিৎসকরা এ বিষয়ে তাঁর থেকে বেশি জানেন সেহেতু এ হাদিসগুলোর সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য কি আমাদেরকে চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হতে হবে না? এভাবে অন্যান্য পার্থিব (যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক) বিষয়সমূহে তাঁর বাণীগুলোর প্রত্যেকটিকে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে ও তারা সঠিক বলে গ্রহণ করলে তবেই গ্রহণ করা ঠিক হবে, নতুবা নয়। এরূপ চিন্তার পরিণতিতে তাঁর বাণী ও কর্মের আর কোন মূল্য থাকবে না।

চতুর্থত, যদি পার্থিব বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের ইজতিহাদই এমন মারাত্মক ভুলের শিকার হয় তবে সাহাবীদের ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তার অবস্থা আরো শোচনীয় হওয়াই স্বাভাবিক। তাহলে কেন কোনরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়া তাঁদের সব ইজতিহাদভিত্তিক রাজনৈতিক ও অন্যান্য পদক্ষেপ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা হয় (এমনকি যদিও তার সপক্ষে কোরআনের কোন দলিল না থাকে)? এটা কি বৈপরীত্য নয়।

ঐতিহাসিক মানদণ্ডে হাদিসটির অগ্রহণযোগ্যতা

এ হাদিসে এসেছে যে, মহানবী (সা.) খেজুর গাছের পরাগায়ন সম্পর্কে জানতেন না এবং এ কারণেই মানুষের মধ্যে প্রচলিত এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে নিষেধ করেন। ফলশ্রুতিতে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ও অসন্তুষ্ট হয়। ফলে তিনি পার্থিব বিষয়ে তারা তাঁর থেকে অধিক অবগত এ বিষয়টি স্বীকারোক্তি করে তাদের কাছে ক্ষমা চান। কিন্তু

আরবের তৎকালীন ঐতিহাসিক বাস্তবতা–যা থেকে রাসূলও ব্যতিক্রম নন–এ দাবির সাথে সঙ্গতি রাখে না। কারণ, কিভাবে এটা মেনে নেয়া যায় যে, মহানবী (সা.) মদীনায় শিশুকাল থেকে হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ (৫৩ বছর বা অর্ধ শতাব্দীরও অধিক) সময় আরবদের মধ্যে বাস করেছেন এবং মক্কা, তায়েফসহ খেজুর বাগানে পূর্ণ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়িয়েছেন। অসংখ্যবার কৃষকদের বাগানে তাদের কাছে গিয়ে কথা বলেছেন, তাদের ফলনের খোঁজ খবর নিয়েছেন, তাদের সাথে আহার করেছেন, দ্বীনের বাণী প্রচার করেছেন, খেজুর বাগানের ছায়ায় বিশ্রাম করেছেন। অথচ তিনি খেজুরের পরাগায়নের বিষয়টি জানতেন না এবং একবারও এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নি, কিন্তু হঠাৎ করে মদীনায় গিয়ে প্রথমবারের মতো বিষয়টি লক্ষ্য করবেন। এটা কিভাবে সম্ভব, যে ব্যক্তি খেজুর গাছের নিচে বসে খেজুর খেয়ে ও খেজুর বাগানে বড় হয়েছে সে এর পরাগায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত থাকবে না? এটা বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী।

উপসংহার

খেজুর গাছের পরাগায়ন সম্পর্কে রাসূলের অজ্ঞতা নির্দেশকারী হাদিসটি প্রত্যাখ্যাত। কারণ, কোরআনে তাঁর নির্ভুলতার প্রমাণবাহী যে সকল আয়াত রয়েছে তার পরিপন্থী এবং সনদের দিক থেকেও হাদিসটিতে প্রকট সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া এর বিষয়বস্তু হাদিস, বুদ্ধিবৃত্তি এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সমর্থনযোগ্য নয়। তাই এ হাদিসটি পার্থিব বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর জ্ঞানগত ভুলের সপক্ষে কোন প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইবনে হাম্বাল, আহমাদ, মুসনাদ, বৈরুত, ১৪১২হি., দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবি।

২. কুলাইনী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব, আলকাফি, তেহরান, দারুল কিতাবিল ইসলামিয়াহ, ৩য় প্রকাশ।

৩. নাভাভী, ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ, আল মিনহাজ ফি শারহি সাহিহ মুসলিম, বৈরুত, দারুল কালাম, ১৪০৭ হি.।

৪. নিশাবুরি, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবি, ১৪২০হি.।

৫. ইবনে মাজাহ কাযভিনি, মুহাম্মাদ, সুনানু ইবনি মাজাহ, বৈরুত, দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৩ হি.।

৬. মুরতাযা আলআমেলী, সাইয়্যেদ জাফর, খালফিয়াতু মাসা'তিয যাহরা, বৈরুত, ১৪২২ হি.।

৭. তাবাতাবাঈ, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হুসাইন, আলমিযান ফি তাফসিরিল কুরআন।

৮. মিযযি, জামালুদ্দিন ইউসূফ, তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল, গবেষণা বাশার আওয়াদ মা'রূফ, ১৪১৫ হি.।

৯. জাফর সুবহানী, হি. ১৪১৯, ইলাহিয়াত আলা হুদাল কিতাব ওয়স সুন্নাহ ওয়াল আকল, কোম, মুয়াসসাসাহ ইমাম সাদিক (আ.)।

১০. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, প্রথম প্রকাশ, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০৪ হি.।

শিশু ও যুবকদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আচরণ

মুহাম্মাদ আলী চানারানি

সন্তান প্রতিপালনের প্রয়োজনীয়তা

কোন শিশু জন্মের পর থেকে তার পরিবারের নিকট থেকে আলাদা হয়ে অন্যের সাথে জীবন যাপন করার আগ পর্যন্ত লালিত-পালিত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি ধাপ অতিক্রম করে।

১. জন্মের পর থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত শৈশবকালে শিশুরা তার জগৎ সম্পর্কে কিছু জানে না বলে সরাসরি নির্দেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে না।

২. সাত বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের জন্য বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে থাকে। এই পর্যায়ে শিশুরা শিখতে ও নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারে।

প্রথম পর্যায়ে শিশুর প্রতি নির্দেশনা হতে হয় আদেশ এবং মনস্তাত্ত্বিক চাপ ছাড়া পরোক্ষভাবে। বরং শিশুরা উত্তম আচরণের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং তার চারপাশের মানুষদের দ্বারাই নির্দেশিত হয়। আসলে তার চরিত্রের ভিত্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং ভাল স্মৃতি এবং যথাযথ আচরণ তার মনে দাগ কেটে যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশুদেরকে যেমন খুশি তেমন আচরণ করতে দেওয়া উচিত নয় এবং তার ভুল-ত্রুটিগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। উপরন্তু তার মন্দ আচরণকে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং তাকে সময়ের যথাযথ ব্যবহারের সাথে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা এবং ধর্মীয় ইবাদত-বন্দেগি ও ভাল কাজের জন্য উৎসাহিত করা উচিত।[১]

---

[১] বা' তারবিয়া'তে মাকতাবে আ'শনা' শাভীম [আসুন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিপালনের সাথে পরিচিত হই], পৃ. ৭৭-৭৮

দুঃখজনকভাবে, অধিকাংশ মানুষই জানে না যে কখন তাদের শিশুদেরকে প্রশিক্ষণ দান শুরু করতে হবে। কিছুসংখ্যক পিতা-মাতা বিশ্বাস করেন যে, শিশুদের জন্য ছয় বছর বয়সের পর প্রশিক্ষণ শুরু করতে হয় এবং কিছুসংখ্যক পিতা-মাতা বিশ্বাস করেন যে, তিন বছর বয়সের সময় প্রশিক্ষণ শুরু করতে হয়।

অথচ, এই সকল ধরনের বিশ্বাসই ভ্রান্ত। কারণ, যখন একটি শিশু তার জীবনের তিন বছর সময় পূর্ণ করে তখন ৭৫% উত্তম এবং মন্দ বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে গঠিত হয়ে যায়।

কিছুসংখ্যক মনস্তত্ত্ববিদ বিশ্বাস করেন যে, শিশুর জন্মের পর থেকেই তার প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যায়। যাই হোক, অপর কিছুসংখ্যক মনস্তত্ত্ববিদ বলেন যে, শিশুর প্রশিক্ষণ শুরু হয় তার জন্মের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন থেকে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় গভীরভাবে বাস্তব গবেষণার মাধ্যমে এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে, যেকোনো সুস্থ-স্বাস্থ্যবান শিশু তার বুদ্ধিমত্তার ৫০% চার বছর বয়সেই অর্জন করে, ৩০% অর্জন করে আট বছর বয়সে আর সতের বছরে বয়সে অবশিষ্ট ২০% অর্জন করে। সুতরাং যেকোনো চার বছর বয়সী শিশুর ৫০% বুদ্ধিমত্তা রয়েছে এবং দুই ও তিন বছরের মধ্যকার পরিবর্তন আট ও নয় বছর বয়সের পরিবর্তনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

শিশুর লালন-পালন ও নির্দেশনা শুরু করার পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ কার্যকরী হওয়ার জন্য এখন সাধারণভাবে যা মনে করা হয় তার অনেক পূর্ব থেকেই প্রশিক্ষণ শুরু করতে হবে অর্থাৎ জন্মের প্রথম সপ্তাহ থেকেই। প্রথমে একজনকে শারীরিক বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে এবং প্রথম বছর থেকে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহকে বিবেচনা করতে হবে।

একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সময়ের মূল্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও একজন শিশুর কাছে সমান নয়। একটি ১ বছর বয়সী শিশুর কাছে ১ দিন সময়কাল একজন ৩০ বছর বয়সী ব্যক্তির কাছে একই সময়ের তুলনায় অনেক দীর্ঘ হতে পারে। এটি শরীরবৃত্তিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার দিক দিয়ে ছয় গুণ। সুতরাং শৈশবের এই

ফলপ্রসূ সময়কে বৃথা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কেননা, জীবনের প্রথম ছয় বছরের মধ্যে জীবন যাপনের পদ্ধতি আরও নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে।[১]

এ কারণেই ইমাম আলী (আ.) বলেছেন, যে শৈশবকালে শেখে না সে পরিণত বয়সে অগ্রগতি লাভ করতে পারে না।'[২]

সুতরাং শৈশবকাল হলো জীবন যাপনের সঠিক উপায় সম্পর্কে শেখার উপযুক্ত সময়। কারণ, শিশুর অনুকরণ করা, গ্রহণ করা ও শেখার ব্যাপারে খুবই তৎপর থাকে। এই সময়ে শিশুরা আশেপাশের লোকদের সকল ধরনের চলাফেরা, বক্তব্য ও আচরণ তার মধ্যে পরম যত্ন সহকারে এমনভাবে সংরক্ষণ করে যেমনভাবে ফিল্মের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়।

সুতরাং শিশুর মনকে তার শারীরিক বৃদ্ধি এবং বিকাশের সাথে সাথে একটি সঠিক পথে পরিচালিত করা প্রয়োজন। কারণ, যে ব্যক্তি শৈশবকালে সঠিকভাবে নির্দেশনা পায় নি তার ব্যক্তিত্ব পরিণত বয়সে এসে পরিবর্তন করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

সবচেয়ে সুখী তারাই যারা শুরু থেকেই একটি সঠিক এবং উত্তম পদ্ধতিতে প্রতিপালিত হয়েছে এবং যারা উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে গ্রহণ করেছে। কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদের মতে একটি শিশু হলো একটি কচি চারাগাছের মতো যেটাকে মালী খুব সহজেই তার পরিকল্পনা মোতাবেক পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু যারা পুরাতন গাছের মতো এবং খারাপ পথে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তাদেরকে সংশোধন করা নিঃসন্দেহে খুবই কঠিন। যে ব্যক্তি এই ধরনের ব্যক্তির আচরণকে পরিবর্তন করাতে চায় তাকে অবশ্যই অনেক কষ্ট করতে হয়।[৩]

মহানবী (সা.) মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্ত

মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন : 'রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।'[৪]

---

[১] রা'হ বা' রাসমে যেন্দেগী [জীবন যাপনের পথ], পৃ. ১১৮

[২] গুরার আল হিকাম, পৃ. ৬৯৭

[৩] কুদাক আয নাযারে ভিরাসাত বা' তারবিয়া'ত [উত্তরাধিকার ও প্রতিপালনের দৃষ্টিতে শিশু], পৃ. ২২৩-৪

[৪] সূরা আহযাব : ২১

ইতিহাস জুড়ে মানবিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হলেন ইসলামের নবী (সা.)। কারণ, তিনি মানুষকে কথায় শিক্ষাদান ও পথ প্রদর্শনের সাথে সাথে তিনি তাঁর নিজ আচরণের মাধ্যমেও নির্দেশনা দিয়েছেন।

মহানবীর ব্যক্তিত্ব শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়, প্রজন্ম, জাতি, ধর্ম বা এলাকার জন্য দৃষ্টান্ত নয়; বরং তিনি সর্বকালের সব মানুষের জন্য একটি বিশ্বজনীন দৃষ্টান্ত। নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এবং নথি থেকে এখন শিশুদের প্রতি মহানবীর আচরণ ও শিশু ও যুবকদের প্রতি স্নেহের বিষয়টি আলোচিত হলো :

শিশুর ব্যক্তিত্বকে সম্মান করা

বর্তমান বিশ্বে শিশুদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। তাদের প্রতিপালনের ব্যাপারে এবং পরিবার ও সমাজে তাদের সম্মানের বিষয়ে সমাজ ও সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও বর্তমানে মানুষ শিশুদের নির্দেশনার প্রতি ততটা মনোযোগ দেয় না যতটা মুসলমানদের নেতা দিতেন।

যদিও কখনো কখনোও শিল্পোন্নত দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ অনাথ আশ্রম এবং শিশুদের বিদ্যালয় ভ্রমণ করেন, কখনো ছবি তোলা ও মিডিয়া প্রচারের জন্য শিশুদেরকে জড়িয়ে ধরেন, তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানের প্রদর্শনী করেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকেই ইসলামের নবীর সাথে তুলনা করা যায় না। তিনি অতি সরলভাবে ও গভীর মমতা নিয়ে শিশুদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে ও তাদেরকে জড়িয়ে ধরার মাধ্যমে ভালোবাসা প্রদর্শন করে রাস্তা ও গলিপথ অতিক্রম করতেন। শিশুদের প্রতি নবীজীর বিশেষ ভালোবাসা ছিল– সেটি তাঁর নিজের সন্তানই হোক কিংবা অন্য কারো। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শিশুদের প্রতি মমতা ও দয়া মহানবীর বিশেষ অনুশীলনগুলোর অন্যতম ছিল।[১]

এই একই ধরনের অনুশীলনী শিয়া ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ইমামগণ কর্তৃক অব্যাহত ছিল। নিচে এর কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

---

১. আল মাহাজ্জাহ আর বাইদা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬

১. শিশুদের অভিমত জিজ্ঞাসা করা

ইমাম আলী (আ.) তাঁর সন্তানদেরকে অন্যদের উপস্থিতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন করেছেন এবং কোনো কোনো সময় তিনি তাঁর সন্তানদেরকে অন্য ব্যক্তিবর্গের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতেন। একদিন ইমাম আলী (আ.) তাঁর সন্তান ইমাম হাসান (আ.) এবং ইমাম হুসাইন (আ.)-কে কিছু প্রশ্ন করেন। পরবর্তী জন [অর্থাৎ ইমাম হুসাইন (আ.)] বিজ্ঞতার সাথে ও সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। অতঃপর ইমাম আলী (আ.) তাঁর আলোচনায় উপস্থিত হারিস আওয়ারের দিকে ফিরলেন এবং বললেন : 'এই সকল জ্ঞানের বিষয় তোমার সন্তানদেরকে শিক্ষা দাও যাতে তাদের যুক্তিপ্রয়োগ এবং চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়।'[১]

এভাবে ইমাম আলী (আ.) সর্বোচ্চ কার্যকর পন্থায় শিশুদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেছেন এবং তাদের মহত্তম ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং স্বাধীনচেতা করে তুলতে অবদান রেখেছেন।

২. বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া

একটি শিশুর ব্যক্তিত্বের উন্নয়নের অন্যতম মৌলিক বিষয় হলো তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া ও তার সাথে যথাযথ আচরণ করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবিদেরকে এই বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে বলেছেন : 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে স্নেহ কর এবং উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পন্থায় তাদের সাথে আচরণ কর।'[২]

সুতরাং যারা দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সন্তান কামনা করে তারা অবশ্যই সন্তানদেরকে উত্তম প্রশিক্ষণের দ্বারা পরিচালিত করবে এবং অনুচিত আচরণ পরিহার করবে, যেহেতু অনুচিত অনুশীলন দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যোগ্য সন্তান গড়ে তোলার দিকে পরিচালিত করতে পারে না ।

---

১. বিহারুল আনওয়ার, ৩৫তম খণ্ড, পৃ. ৩৫০; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৭

২. বিহারুল আনওয়ার, ১০৪তম খণ্ড, পৃ. ৯৫, হা. ৪৪

৩. প্রতিশ্রুতি পূরণ

শিশুদের প্রতি প্রতিশ্রুতি পূরণ তাদের আত্মবিশ্বাস গঠনে ভূমিকা রাখে এবং তাদের চরিত্রকে প্রভাবিত করে। ইসলামের প্রকৃত নেতারা সর্বদাই শিশুদের প্রতি প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণভাবে পূরণের উপদেশ দান করেন। নিচে এর কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

ইমাম আলী (আ.) বলেছেন : 'মিথ্যা বলা যথোচিত নয়– তা প্রকৃতই হোক কিংবা কৌতুক করে। কোনো ব্যক্তির তার সন্তানকে প্রতিশ্রুতি দান এবং তা পূরণে ব্যর্থ হওয়া যথোচিত নয়।'[১]

ইমাম আলী (আ.) আরো বলেছেন : "মহানবী (সা.) বলেছেন : 'যদি তোমাদের কেউ তার সন্তানকে প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে তাকে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে।"[২]

৪. শিশুদেরকে জীবনের সমস্যাবলির সাথে পরিচিত করানো

সন্তানদেরকে, বিশেষ করে ছেলেসন্তানদেরকে জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সাথে পরিচিত করানো হলো একটি শিশুর ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় করার অন্যমত পদ্ধতি যাতে তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা যায়। শিশুকে অবশ্যই অনুশীলনের মাঝে বুঝবে যে, কাউকে কোনো কিছু অর্জন কতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। যদি একটি শিশু এই সকল সমস্যা ও জীবন যাপনের কঠিন অবস্থার সাথে পরিচিত না হয় তাহলে যখন সে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হবে তখন সে সহজেই হতাশ হয়ে পড়বে। এটি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্যেও আলোচিত হয়েছে।

ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.) বলেছেন : 'জীবনের অনিবার্য কঠিন অবস্থাসমূহের সাথে, যেগুলো জীবনের .... শিশুদেরকে বাল্যকালেই পরিচিত করানো অপেক্ষাকৃত ভাল যাতে সে পরিণত বয়সে ধৈর্যশীল হতে পারে।'

এদিকে স্মরণ রাখতে হবে যে, শিশুকে জীবনের সমস্যাবলির সাথে অভ্যস্ত করে তোলা এমনভাবে হয় যাতে তার জন্য কষ্টকর হয়ে না দাঁড়ায়। যেমন তাকে যে কাজ

---

[১] বিহারুল আনওয়ার, ২৯৫তম খণ্ড, পৃ. ৭২; আমালী, সাদুক, পৃ. ২৫২

[২] মুস্তাদরাক আল-ওয়াসায়েল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৬; ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৬, পুরাতন প্রিন্ট।

দেয়া হবে তা যেন তা সাধ্যের বাইরে না হয়। সুতরাং শিশুর সক্ষমতাকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। মহানবী (সা.) আমাদেরকে এ ক্ষেত্রে চারটি মূল বিষয় সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

ক. শিশুটি যা করতে পেরেছে সেটাই গ্রহণ করে নেয়া উচিত।

খ. শিশুকে এমন কঠিন কাজ করতে বলা যাবে না যা তার সাধ্যের বাইরে।

গ. শিশুকে পাপ কাজ করায় কিংবা বিদ্রোহী হতে প্ররোচিত করা যাবে না।

ঘ. শিশুকে মিথ্যা বলা যাবে না ও তার সামনে অনুচিত কাজ করা যাবে না।

বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সাত বছর বয়সী ছিলেন তখন একদিন তিনি তাঁর পালনকারী (হালিমা সাদিয়া)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : 'আমার ভাইয়েরা কোথায়?' (নবীজী হালিমার ঘরে থাকতেন এবং তাঁর সন্তানদেরকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করতেন।) তিনি জবাব দিলেন : 'প্রিয় পুত্র! তারা ভেড়ার চড়ানোর জন্য গেছে, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন।' শিশুটি জবাব দিলেন : 'হে আম্মাজান! আপনি আমার সাথে ন্যায় আচরণ করেন নি।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'কেন?' মহানবী (সা.) জবাব দিলেন : 'এটি কি ঠিক, যখন আমার ভাইয়েরা মরুভূমিতে উত্তপ্ত সূর্যের মধ্যে রয়েছে তখন আমি তাঁবুর ছায়ায় বসে থাকব আর দুধপান করব?'[১]

৫. শিশু যা করে তার জন্য প্রশংসা করা

মহানবী (সা.) সন্তান লালন-পালন ও তাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যা তাঁর সাহাবিদেরকে উপদেশ দিতেন, তিনি নিজেও সেগুলোর অনুশীলন করতেন। তিনি প্রায়শই যে কাজগুলো করতেন তার অন্যতম হলো শিশুরা কোনো কাজ করলে তিনি সেই কাজের উচ্চ মর্যাদা দিতেন ।

---

১. বিহারুল আনওয়ার, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬

আমর ইবনে হারিস এরূপ বর্ণনা করেন : “মহানবী (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের পাশ দিয়ে গেলেন যখন সে ছোট ছিল। মহানবী তার জন্য দোয়া করলেন : ‘হে আল্লাহ! তার কর্মকাণ্ড ও বাণিজ্যে আপনি বরকত দিন।”[১]

৬. শিশুর উপস্থিতিতে উঠে দাঁড়ানো

নিজের সন্তানদের প্রতি স্নেহ প্রদশর্নের জন্য মহানবী (সা.) নামাযের সিজদা দীর্ঘায়িত করেতেন বা নামায দ্রুত শেষ করতেন (পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে)। সর্বক্ষেত্রেই তিনি শিশুদের স্নেহ করতেন এবং তিনি লোকদেরকে বাস্তবে দেখিয়ে দিতেন কীভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রশিক্ষণ দিতে হয়। একদিন ইমাম হাসান (আ.) এবং ইমাম হুসাইন (আ.) মহানবী (সা.)-এর নিকট এলেন যখন তিনি বসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। যেহেতু তাঁরা ছোট এবং দুর্বল ছিলেন এজন্য তাঁদের পৌঁছতে কিছুটা সময় লাগছিল। মহানবী (সা.) তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করে তাঁদের উভয়কেই তাঁর কাঁধে উঠিয়ে নিলেন এবং এটি বলতে বলতে হাঁটতে থাকলেন : ‘তোমরা কতই না উত্তম সওয়ার পেয়েছ আর তোমরাও উত্তম সওয়ারী।’[২]

মহানবী (সা.) তাঁর কন্যা ফাতিমা যাহরা (আ.)-এর উপস্থিতিতেও উঠে দাঁড়াতেন।[৩]

৭. সন্তানদের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা

একদিন ইমাম (হাসান) মুজতবা তাঁর সন্তান ও ভাতিজাদেরকে ডাকলেন এবং তাঁদেরকে বললেন : ‘তোমরাই সমাজের সন্তান। এটি আশা করা হয় যে, ভবিষ্যতে তোমরা সমাজের মহান সদস্য হবে এবং তোমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করবে। তোমাদের যে কেউ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয় মুখস্থ করতে পার না সে তা

---

[১] মাজমা আল-জাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬

[২] বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ৪৩, হা. ৫১; মানাকিব ইবনে শাহরে আ'শুব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৮

[৩] সীরাতুল হালাভীয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮

লিখে রাখবে, লিখিত বিষয় বাড়িতে রাখবে এবং যখই প্রয়োজন হবে তখন সেখানে থেকে উল্লেখ করবে।’[১]

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমাম মুজতাবা শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং অভিভাবকদেরকে এই বাস্তবতার সাথে পরিচিত করিয়েছেন । এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের পাশ দিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি তাঁর জন্য দোয়া করলেন : ‘হে আল্লাহ! তার কর্মকাণ্ড ও ব্যবসায় বরকত দান কর।’[২]

৮. ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষা দেওয়া

যদি শিশুরা নামায এবং ইবাদত-বন্দেগির অন্যান্য বিষয় অনুশীলন করে তাহলে এই সকল কর্মকাণ্ড তাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্রের ওপর উজ্জ্বল প্রভাব ফেলে। যদিও একটি শিশু নামাযের মধ্যকার শব্দ বা বাক্যের অর্থ না-ও বুঝতে পারে, কিন্তু নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে শুরু করবে এবং এটি তাকে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম করে তুলবে। সে কঠিন পরিস্থিতিতে মানসিক শান্তি অনুভব করবে এবং আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভ করবে। আল্লাহ বলেছেন : ‘তারা সেসব লোক যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের চিত্ত আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।’

খোদাভীরু এবং ধার্মিক করে গড়ে তোলার জন্য শিশুদের শরীর ও আত্মার মধ্যে সঙ্গতি সাধনের প্রয়োজন রয়েছে। পরিশেষে ইসলাম অভিভাবকদেরকে তাদের শিশুদের মনোযোগ খোদামুখী করতে এবং তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের ও ধর্মীয় নিয়ম-কানুন সম্পর্কে শিক্ষা দিতে বাধ্য করেছে। ইসলাম অভিভাবকদেরকে তাদের শিশুদের নামায পড়্যানোর আদেশ দিয়েছে।

মুয়াবিয়া ইবনে ওয়াহাব ইমাম সাদিক (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করেন : ‘কত বছর বয়সে আমরা শিশুদেরকে নামায পড়াব?’ ইমাম বললেন : ‘তাদেরকে ছয় থেকে সাত বছরের মধ্যে নামায পড়তে বাধ্য কর।’

---

[১] বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ২৫, হা. ২২

[২] মাজমাউল জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬

মহানবী (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : ‘সাত বছর বয়সে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামায পড়তে বাধ্য কর।’

অন্য একটি বর্ণনায় শিশুদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : “তিন বছর বয়সে সন্তানকে তাওহীদের শব্দসমূহ অর্থাৎ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই) বলার শিক্ষা দাও। চার বছর বয়সে সন্তানকে ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ (মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল) বলা শিক্ষা দাও। পাঁচ বছর বয়সে তাকে কিবলামুখী কর এবং তাকে আল্লাহর সামনে সিজদা করতে আদেশ দাও। ছয় বছর বয়সে তাকে আল্লাহর সামনে রুকু করাও এবং তাকে সিজদা করার সঠিক নিয়ম শিক্ষা দাও। সাত বছর বয়সে শিশুকে হাত এবং মুখ ধৌত (ওযূ) করতে এবং নামায পড়তে বল।”[১]

পিতা-মাতা এবং প্রশিক্ষকের সতর্ক হওয়া উচিত যে, ধর্ম হলো তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সাহায্য; কারণ, বিশ্বাস হলো একটি জ্বলন্ত মশালের মতো যা পথকে আলোকিত করে এবং বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত করে। যেখানেই পথভ্রষ্টতা রয়েছে সেখানেই এটি সহজেই সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারে।

শিশুদেরকে সঠিক পথে চলার নির্দেশনা প্রদানের প্রভাবসমূহ

শিশুদেরকে যথাযথভাবে নির্দেশনা প্রদান তাদেরকে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনে সক্ষম করে তোলে। আর তাদেরকে সম্মান করা তাদেরকে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং তাদের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা দান করে এবং যখন তারা বয়োপ্রাপ্ত হয় তখন অমর্যাদাকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হতে হয় না। ইসলামের বক্তব্য অনুসারে শিশু এবং তার হৃদয় বীজ বা চারাগাছবিহীন একটি জমির মতো। সেখানে কেউ যে বীজই বপন করবে সেটারই শিকড় গজাবে।[২]

উদাহরণস্বরূপ, ইমাম আলী (আ.)-এর চরিত্র মহানবী (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত হওয়ার ফলে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। যদিও ইমাম আলী শারীরিক বা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে কোনো সাধারণ শিশু ছিলেন না এবং তার নিজের মধ্যেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, তবুও

---

[১] মাকারিমুল আখলাক, তাবারসী, পৃ. ১১৫

[২] নাহজুল বালাগা, ফায়েয, পত্র, ৩১তম খণ্ড, পৃ. ৯০৩

মহানবী (সা.) তাঁর প্রতি যে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন এ বিষয়টি কারো উপেক্ষা করা উচিত নয়। শিশুকে যথাযথ নির্দেশনার ফল হলো যে, এতে শিশু সাহসী হয়ে উঠবে।

ইমাম জাওয়াদ (আ.) সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম রেযা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর তৎকালীন খলিফা মামুন বাগদাদে এসেছিলেন। একদিন তিনি শিকারে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে তিনি এমন এক স্থানে পৌঁছলেন যেখানে কয়েকটি শিশু খেলা করছিল। ইমাম রেযার পুত্র ইমাম জাওয়াদ যাঁর বয়স তখন ১১ বছর ছিল, তিনিও সেই শিশুগুলোর মধ্যে ছিলেন। যখন মামুন এবং তাঁর সহচররা সেখানে পৌঁছলেন তখন ইমাম জাওয়াদ ছাড়া সব শিশু দৌড়ে চলে গেল। খলিফা তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন এবং তাঁর অভিব্যক্তিতে তীব্রভাবে আকৃষ্ট হলেন। খলিফা দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি অন্যান্য শিশুর সাথে কেন দৌড়ে চলে গেলে না?'

ইমাম জাওয়াদ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন : 'হে মুসলমানদের খলিফা! এই পথ এত সংকীর্ণ নয় যে, খলিফার জন্য রাস্তা প্রশস্ত করতে আমি দৌড়ে চলে যাব। আমি কোন ভুল করি নি যে, আমাকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করতে হবে। আমি খলিফা সম্পর্কে আশাবাদী এবং মনে করি যে, তিনি নির্দোষদের কোন অনিষ্ট করবেন না। একারণে আমি পালিয়ে যাই নি।' মামুন তাঁর যুক্তিসঙ্গত জবাব শুনে এবং তাঁর আকর্ষণীয় অভিব্যক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : 'তোমার নাম কী?' তিনি জবাব দিলেন : 'মুহাম্মাদ।' মামুন জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি কার ছেলে?' তিনি জবাব দিলেন : 'আলী ইবনে মূসা আর রেযা।'[১]

(চলবে)

অনুবাদ : সরকার ওয়াসি আহম্মেদ

---

[১] বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ৯১; কাশফুল গুম্মাহ।

পর্যালোচনা

আবদুল্লাহ ইব্‌নে সাবা'র ওপর একটি পর্যালোচনা

আবদুল্লাহ ইব্‌নে সাবা’র ওপর একটি পর্যালোচনা

মূল : আসাদ্‌ হায়দার্‌

এমন ব্যক্তি কমই পাওয়া যাবে যিনি ইসলামের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন অথচ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে সাবা’ সম্পর্কে আলোচনা করেন নি।

ইব্‌নে সাবা’ একটি কাল্পনিক চরিত্র লোকেরা যার ওপর বিভিন্ন কাল্পনিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে এবং যাকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কল্পকাহিনী তৈরি করেছে। কতক লোক তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা করেছে : সে ছিল একজন দুঃসাহসিক যোদ্ধা যার জন্য সফরের কষ্টসমূহ খুবই সহজ ছিল এবং এ কারণে সে অত্যন্ত সহজেই মদীনা থেকে মক্কা এবং সেখান থেকে বসরা, কুফা, শাম ও অন্যান্য স্থানে সফর করতে সক্ষম হয় এবং তৎকালীন ইসলামি জাহানে এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে সে সফর করে নি। সে বিদ্যুত গতিতে যাতায়াত করত এবং একজন জাদুকরের ন্যায় বিস্ময়কর চরিত্র ছিল।

এ কাল্পনিক চরিত্রটি সম্পর্কে বলা হয়েছে : সে কুফ্‌র্‌ ও নাস্তিকতার প্রচারক ছিল। সে তার মতাদর্শের দ্বারা লোকদেরকে গোমরাহ্‌ করত এবং লোকদের চিন্তা-চেতনাকে বিষাক্ত করে তুলত। সে যরথুস্ত্রী আক্বায়েদের প্রচার করত এবং সে লোকদের চিন্তা-চেতনায় এমনভাবে প্রভাব বিস্তার ও অনুপ্রবেশ করে যে, লোকেরা তার বক্তব্যকে সঠিক বলে সাক্ষ্য দিত এবং তার আদেশের আনুগত্য করত। আরবরা তার এক ইশারায়ই ওঠ-বস করত এবং সে যেদিকে যাবার ইশারা করত তারা বিনা বাক্যব্যয়ে সেদিকে যেত। ফলত এমনকি কতক সাহাবী পর্যন্ত তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং তার চিন্তাধারাকে গ্রহণ করে নেন। বলা হয়, আবূ যার গ্বিফারী–যিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের অন্যতম এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) যার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন–ইব্‌নে সাবা’র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তেমনি আম্মার বিন ইয়াসির–যিনি ও যাঁর পিতা-মাতা আল্লাহ্‌ তা‘আলার জন্য উৎসর্গপ্রাণ ছিলেন–ইব্‌নে সাবা’র আক্বায়েদ গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। যেসব দুনিয়ালোভী লোক

স্বর্ণ-রৌপ্য তথা পার্থিব ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করত তাদের বিরুদ্ধে আবূ যারের অনবরত প্রচারকার্যও ইব্‌নে সাবা'র ইশারায়ই সংঘটিত হয়েছিল এবং উসমানের বিরুদ্ধে যে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল তা-ও ছিল তারই ষড়যন্ত্রের ফসল। জঙ্গে জামাল ও সিফ্‌ফীন্‌ যুদ্ধের পর্দার অন্তরালের নায়কও সে-ই ছিল। শিয়া মতাদর্শের চৈন্তিক ভিত্তিও সে-ই প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ...।

ইতিহাসের নামে এ ধরনের বিস্ময়কর কল্পকাহিনী শোনার পর বলতে হয় : আফ্‌সোস্‌! কোথায় গেল বিচারবুদ্ধি ('আক্‌ল) ও যুক্তিবোধ!! আফ্‌সোস্‌! কী করে এমনভাবে সত্য বিলুপ্ত হয়ে গেল ও মিথ্যা তার জায়গা দখল করে নিল!! বস্তুত 'আক্‌ল্‌ ও প্রকৃত ঘটনার মধ্যে যা কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেসবের মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে অন্ধ বিশ্বাস, অন্ধ প্রীতি ও বিদ্বেষ, মতানৈক্য ও অজ্ঞতা– যার ফলশ্রুতিতে বিরাট বিরাট মিথ্যাকেও সত্যায়ন ও লালন-পালন করা হয়।

এ কল্পকাহিনীর পিছনে নিহিত প্রকৃত বিষয় উদ্ঘাটন করতে হলে অনেক পিছনে যেতে হবে এবং এ কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব গঠনের পিছনে যেসব কারণ নিহিত ছিল সেগুলো অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ, নিঃসন্দেহে এ ধরনের কল্পকাহিনী তৈরির পিছনে কোনো গোপন হাত সক্রিয় ছিল– যে গোপন হাত দ্বীন ইসলামের পবিত্র ব্যক্তিত্ববর্গ ও বিষয়াদির প্রতি এভাবে হামলা চালিয়েছিল এবং মুসলমানদের ঐক্যকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল– যারা এখনো চুপচাপ বসে নেই। তাই এ নোংরা হাতগুলো যাদের তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা এবং তাদেরকে চিহ্নিত ও লাঞ্ছিত করা, আর তাদের দ্বারা বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির বিপদ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে ওয়াকেফহাল ও সচেতন করা আমাদের দায়িত্ব।

কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, যেহেতু সুদীর্ঘ কাল অতীত হয়ে গিয়েছে এবং কাল ও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে এ কল্পকাহিনী ইতিহাসের গর্ভে দাফন হয়ে গিয়েছে, তাই কবর খুলে এর লাশ বের করায় কোনোই ফায়দা নেই, সেহেতু এখন ইব্‌নে সাবা'র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা একটি ভুল কাজ। এর জবাবে বলব : এ বিষয়টি আপনারা যেভাবে মনে করছেন সেভাবে পুরোপুরি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় নি, বরং প্রত্যেক যুগেই এ কল্পকাহিনীর একটি নতুন কপি হাযির করা হয় এবং এটিকে অনবরত পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। আর যেহেতু এ কল্পকাহিনীটিকে কল্পকাহিনী আকারে নয়; বরং একটি প্রামাণ্য কাহিনীরূপে তৈরি করা হয়েছে সেহেতু শিয়াবিরোধী

লেখকরা এটিকে শিয়াদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে মৌলিক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে দাবি করে ব্যবহার করে থাকে– যা অসংখ্য সরলমনা মানুষের মনে শিয়া সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করছে। এমনকি যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছ থেকে বিচারবুদ্ধিভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ আচরণ প্রত্যাশা করা হয় এমন অনেকেও শিয়াদের বিরুদ্ধে এ কল্পকাহিনী কাজে লাগানোর কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে থাকেন নি। আমরা আশা করছি যে, এখানে এ কল্পকাহিনীর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবার পর তাঁরা সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং মতানৈক্যের তবলা বাজানো হতে বিরত থাকবেন।

বিশেষ করে যেসব মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক জ্ঞান-গবেষণায় রত আছেন তাঁদের কাছ থেকে স্বভাবতঃই প্রত্যাশা করা হয় যে, তাঁরা ইসলামি উম্মাহ্কে সচেতন ও জাগ্রত করার জন্য চেষ্টা চালাবেন– যাতে তাঁদের জ্ঞান-গবেষণার কাজ থেকে সকলেই উপকৃত হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে, তাঁদের মধ্যকার কেউ কেউ এমন সব বিষয়ের সামনে আত্মসমর্পণ করে আছেন যেসবের মোকাবিলায় রুখে দাঁড়ানো তাঁদের জন্য অপরিহার্য ছিল এবং তাঁদের স্কন্ধে যে বিরাট দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে সে কারণে তাঁদের উচিত ছিল কোনো কিছু উদ্ধৃত করার ও কোনো কিছুর সমালোচনা করার ক্ষেত্রে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে আচরণ করা। কিন্তু তাঁরা যা কিছু শুনছেন বা পড়ছেন তার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়েই তা উদ্ধৃত করছেন। তাঁদের এ ধরনের আচরণের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইবনে সাবা'র কল্পকাহিনীকে এমন একটি সত্য ঘটনা হিসেবে মেনে নেয়া ও উদ্ধৃত করা, তাঁদের আচরণে মনে হয়, যেন তা খণ্ডন করা আদৌ সম্ভবপর নয়।

বিগত বহু শতাব্দী যাবত অনবরত এ মিথ্যাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আমরা জানি না, আগামী প্রজন্ম–যে প্রজন্ম হবে তাদের অতীত ও বর্তমান কালের লোকদের তুলনায় অধিকতর দূরদৃষ্টির অধিকারী ও অধিকতর সচেতন–কীভাবে সেই লোকদের সম্পর্কে বিচার-ফয়সালা করবে যাঁরা বিচারবুদ্ধির কাছে অগ্রহণযোগ্য ঐ অযৌক্তিক মিথ্যাটিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেটির ওপর নির্ভর করেছিলেন। অবশ্য বর্তমান যুগেও আমরা এমন গবেষকদের দেখতে পাই যাঁরা বিচারবুদ্ধির ফয়সালার অনুসরণ করছেন এবং এ কল্পকাহিনীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ও এর মধ্যকার স্ববিরোধিতা উদ্ঘাটন করেছেন।

আমাদের মতে, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য অভিষিক্ত হওয়ার সময় থেকে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এ বিষয়টির আলোচনা পুরোপুরিভাবে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করা সম্ভব নয় এবং তা আলোচনা করলে সে কাজটি মোটেই ইতিহাসের কবর খোলার নিষ্ফল কাজ হবে না। কারণ, তাশাইয়্যু (শিয়াত্ব)-এর মূল রিসালাতের বীজের অঙ্কুরোদ্গমের মধ্যে নিহিত এবং তা রিসালাতের ছায়ায়ই বিকাশ লাভ করে। সীরাতে নাবাভী (সা.), বেলায়াতে 'আলী (আ.) ও দ্বীনের হেফাযতে আহ্লে বাইতের (আ.) ভূমিকা হচ্ছে এমন ঘটনাবলি, ইতিহাস যা লিপিবদ্ধ করেছে– ইসলামের ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা ও বিবর্তনে যেসব ঘটনার প্রভাবের উপস্থিতি অনস্বীকার্যভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আমরা যখন আহ্লে বাইতের দুশমনদের ও তাঁদের বিরোধীদের হামলাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন দেখতে পাই যে, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। তারা রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার লক্ষ্যে দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। আর আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা' নামে কল্পকাহিনী রচনার পিছনে ইসলামের প্রকৃত দুশমনদের নোংরা হাত সক্রিয় ছিল যার উদ্দেশ্য ছিল আহ্লে বাইতের আদর্শের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করা এবং তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে প্রশ্নবিদ্ধ ও সংশয়পূর্ণ করে তোলা।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এই যে, আজকের দিনেও আমরা দেখতে পাই, কতক লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও উদ্ধৃতিসমূহের প্রতি 'ইল্মী ও 'আক্লী দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টিপাত না করে এ ধরনের মিথ্যা কল্পকাহিনীকে চোখ বুঁজে মেনে নেন এবং তার প্রচার করেন, আর এ থেকে তাঁরা এমন কতক উপসংহারে উপনীত হন যা তাঁদের মতামতের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাই আমরা আমাদের এ আলোচনার ধারাবাহিকতায় এ ধরনের কতক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করতে চাই যাঁরা ইব্নে সাবা'র কল্পকাহিনীর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং এটিকে শিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন।

শায়খ্ আবূ যাহ্রা

শায়খ্ মুহাম্মাদ্ আবূ যাহ্রা আল্-আয্হার্ বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমগণের অন্যতম এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূলে ফিক্হ্ ফ্যাকাল্টির অধ্যাপক; তিনি *শিয়া : ইসলামের দুশমনদের আবরণ* শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেন :

'আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, শিয়া ছিল ফার্স, ইয়াহূদ, রূম্ ইত্যাদি ইসলামের অনেক দুশমনের জন্য আবরণ– যারা ইসলাম ও ইসলামি সরকারের ওপরে আঘাত হানার লক্ষ্যে এর পিছনে আত্মগোপন করেছে, ...। এ দুশমনরা যেহেতু নিজেদেরকে দুর্বল বলে অনুভব করছিল সেহেতু তারা নিজেদের মুক্তির জন্য অপকৌশল ও ধোঁকা-প্রতারণার আশ্রয় নেয়। তাদের মধ্যে কতক লোক বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে এবং শিয়াদের–যারা আহ্লে বাইতকে ভালোবাসত–পথানুসারীর বেশ ধারণ করে এবং, তাদের ভাষায়, 'আলী (রাযীয়াল্লাহু 'আন্হ্)-এর প্রতি যুলুমকারীদের সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে। তারা এ মায্হাবের মধ্যে বিভিন্ন ফিতনা তৈরি করে এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত শিয়াদের অনেককেই সহীহ্ দ্বীন্ থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং স্বীয় বিকৃত 'আকীদাসমূহকে এ মায্হাবে প্রবেশ করিয়ে দেয়– যেসব 'আকীদা দ্বীনের জন্য বিষতুল্য এবং যা ইসলামের আহ্কাম ও শিক্ষাসমূহকে দুর্বল করে ফেলে। এ ফিতনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিতনা ছিল–ঐতিহাসিকগণ যা লিখেছেন তদনুযায়ী–এই যে, আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা' নামে জনৈক ইয়াহূদী ব্যক্তি ছিল; সে আলীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি (গুলূ) করে, এমনকি সে ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর (আলীর) মধ্যে প্রবেশ করেছেন, আর সে জনগণকে উসমানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করার জন্য উস্কানি দেয়, ...।'

এই হলো শায়খ্ মুহাম্মাদ্ আবূ যাহূর উক্তি– যিনি স্বীয় মতকে অকাট্য বলে মনে করেন এবং তা স্বীয় ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেন ও তাদের মধ্যে এরূপ ধারণা প্রবেশ করিয়ে দেন যে, ইয়াহূদীরা ইসলামের ওপর প্রাধান্যের অধিকারী হয়েছিল। কারণ, তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি অপকৌশল ও ধোঁকা-প্রতারণার সাহায্যে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সাহাবীদেরকে প্রতারিত করে তার পিছনে নিয়ে আসতে এবং তাঁদেরকে স্বীয় 'আকীদাসমূহ গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছিল। আর তাঁরাও কোনো রকমের চিন্তা-ভাবনা না করেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং এমন আকীদা গ্রহণ করে নেন যা একজন ইয়াহূদী ব্যক্তি প্রবর্তন করে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এটা কক্ষনো সম্ভব নয়, কারণ, নিঃসন্দেহে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সাহাবিগণের শা'ন এমন নির্বুদ্ধিতাসুলভ আচরণ করার এবং নিজেদেরকে এভাবে ধ্বংস করার তুলনায় অনেক উর্ধ্বে ছিল। কিন্তু শায়খ্ আবূ যাহূ কোনোরূপ অকাট্য দলিল-প্রমাণ ব্যতীতই এ কল্পকাহিনীকে সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং এটিকে দলিল হিসেবে প্রদর্শন করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ও আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

মুহাম্মাদ্ আবূ যুহ্রাহ্

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টির ডীন অধ্যাপক শায়খ্ মুহাম্মাদ্ আবূ যুহ্রাহ্ হযরত উসমানের শাসনামলে ফিতনা সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করার পর বলেন[১] : 'উসমান স্বীয় ওয়ালী (প্রাদেশিক প্রশাসক)-দেরকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে বেছে নিতেন, আর এ বিষয়টির কারণেই তিনি স্বজনপ্রীতির জন্য অভিযুক্ত হন। এ ওয়ালিগণের মধ্যে কেউ কেউ বেশিদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেন নি এবং তাদের মধ্যে এমন কতক ব্যক্তিও ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যাদেরকে মুর্তাদ হওয়ার কারণে হত্যাযোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিল আবদুল্লাহ্ বিন্ সা'দ্ বিন্ আবী সারাহ্– উসমান যাকে 'আম্র্ বিন্ আল্-'আস্-এর স্থলে নিয়োগ দিয়েছিলেন, আর এ কারণেই 'আম্র্ বিন্ আল্-'আস্ জনগণকে উসমানের বিরুদ্ধে উস্কানি দেন। এমনকি তিনি এ-ও বলেন : 'আমি যাকেই দেখব তাকেই উসমানের বিরুদ্ধে উস্কে দেব।' আব্দুল্লাহ্কে নিয়োগের ফলে উসমানের সমালোচনা বেড়ে যায়। লোকেরা বলতে থাকে : তিনি এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়েছেন যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপরে মিথ্যাবাদী হবার অপবাদ আরোপ করেছিল, ...।'

অধ্যাপক মুহাম্মাদ্ আবূ যুহ্রাহ্ তাঁর আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলেন : 'উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ইসলামি সমাজের মধ্যে মুনাফিকদের উপস্থিতি– যারা বাহ্যত মুসলমান ছিল, কিন্তু তারা তাদের এ বাহ্যিক ইসলামকে জনগণকে প্রতারণা করার ও নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে ব্যবহার করত। তারা উসমানের বিরুদ্ধে বদনাম করতে ও আলী বিন্ আবী তালিবের প্রশংসা করতে থাকে এবং মুসলমানদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ওয়ালীর আচরণ তাদের জন্য বাহানা তৈরি করে দেয়– যাকে পুঁজি করে তারা উসমানের বিরুদ্ধে অধিকতর হামলা করতে সক্ষম হয়। এ গোষ্ঠীটির প্রধান ব্যক্তি ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা'– যার সম্পর্কে ইব্নে জারীর্ ত্বাবারী বলেন :

---

[১] *আল্-মাযাহিবুল্ ইস্লামীয়াহ্*, আবূ যুহ্রাহ্, পৃ. ৪৭।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা’ ছিল ইয়াহূদী। সে ছিল সান্‌‘আ-র অধিবাসী এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ মায়ের সন্তান। সে উসমানের শাসনামলে ইসলাম গ্রহণ করে, এরপর সে মুসলমানদের ভূখণ্ডে চলে আসে এবং মুসলমানদেরকে গোমরাহ্ করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। প্রথমে সে হেজাযে প্রবেশ করে। এরপর সে বসরায় যায় এবং সেখান থেকে শামে যায়। শামে সে কারো ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি এবং শামের লোকেরা তাকে সেখান থেকে বের করে দেয়। এরপর সে মিসরে যায় এবং তাদেরকে (মিসরের লোকদেরকে) বলে : ‘আমি সেই লোকদের ব্যাপারে বিস্মিত হচ্ছি যারা এটা বিশ্বাস করে যে, ঈসা ফিরে আসবেন, কিন্তু মুহাম্মাদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি অস্বীকার করে।’ আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন : إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ – ‘নিঃসন্দেহে যিনি (হে রাসূল!) আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন তিনি আপনাকে আপনার প্রত্যাবর্তনস্থলে (স্বদেশে) ফেরত পাঠাবেন।’[১] সুতরাং ফিরে আসা (রুজ্‌‘আত্)-এর ব্যাপারে মুহাম্মাদ (সা.) ঈসার চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত, ...। হাজার হাজার নবী আগমন করেন এবং প্রত্যেক নবীরই ওয়াসী ছিল, আর আলী হচ্ছেন মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওয়াসী। মুহাম্মাদ খাতামুন্নাবীয়্যীন্ এবং আলী খাতামুল্ ওয়াসীয়্যীন্, ...। উসমান অন্যায়ভাবে খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওয়াসী হলেন আলী। সুতরাং আমাদেরকে উসমানের খেলাফতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং তার ওয়ালিগণের বিরুদ্ধে আম্‌র্ বিল্-মা‘রূফ্ ওয়া নাহি ‘আনিল্ মুন্‌কার্ করতে হবে যাতে জনগণ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ...। ইব্‌নে সাবা’ বিভিন্ন শহরে পত্র লিখে এবং লোকদেরকে ওয়ালিগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য আহ্বান জানায়। এছাড়া সে লোকদেরকে তার আকায়েদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতে থাকে। সে তার পত্রসমূহে ওয়ালিগণের দোষত্রুটিকে অনেক বড় করে দেখাত এবং এ সব কাজের সবই সে “আম্‌র্ বিল্-মা‘রূফ্ ওয়া নাহ্‌য়ী ‘আনিল্ মুন্‌কার্”-এর আবরণে আঞ্জাম দিত। কিন্তু সে ও তার সমর্থকরা অন্য উদ্দেশ্য সাধনের পিছনে লেগে ছিল, আর সে অন্তরে যে উদ্দেশ্য পোষণ করত তা ছিল সে যা প্রকাশ করত তা থেকে ভিন্ন কিছু।’

এখানে যা উল্লেখ করা হলো তা হচ্ছে মশ্‌হূর্ ঐতিহাসিক ত্বাবারীর উদ্ধৃতি– যাতে ইসলামি সমাজে ফাটল সৃষ্টির লক্ষ্যে ইব্‌নে সাবা’ ও তার অনুসারীদের ষড়যন্ত্রের কথা

---

[১] সূরা আল্-ক্বাছাছ্ : ৮৫।

সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত উসমানের দুর্নীতিপরায়ণ ওয়ালিগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিষয়টি ছিল তাদের বিকৃত চিন্তাধারা প্রচারের বাহানা মাত্র। কারণ, এ ফিতনার ছায়ায় শিয়া মাযহাব বিকাশ লাভ করে, যদিও স্বয়ং শিয়ারা দাবি করে থাকে যে, তাদের মূল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে ও তাঁর ইন্তেকালের সময়ে নিহিত রয়েছে।[১]

আহ্মাদ্ আমীন্

অধ্যাপক আহ্মাদ্ আমীন্ দাবি করেছেন যে, আবূ যার্ গ্বিফারীর ওপর ইব্নে সাবা' প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি বলেন : 'আমরা আবূ যারের অর্থনৈতিক আকায়েদের প্রতি দ্রুত দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, তাঁর আকায়েদ মায্দাকের আকায়েদের খুবই কাছাকাছি। ত্বাবারী বলেন : "আবূ যার্ যখন শামে ছিলেন তখন বলতেন : 'হে ধনীরা! দরিদ্রদের আহ্বানে সাড়া দাও। যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা ব্যয় করে না তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রচণ্ড উত্তপ্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং তা দ্বারা তাদের কপাল ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করবেন।' দরিদ্র লোকেরা তাঁর এ বক্তব্যকে স্বাগত জানায় এবং ধনীদের দোষ ধরতে থাকে। আর ধনীরা, এভাবে তাদের দোষ ধরার কারণে, লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।" আবূ যার্ যাতে শামবাসীদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারেন সে লক্ষ্যে মুআবিয়া তাঁকে মদীনায় উসমানের কাছে পাঠিয়ে দেন। উসমান যখন আবূ যার্কে জিজ্ঞেস করলেন : 'শামবাসীরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে কেন?' তখন তিনি জবাব দেন : 'ধনীদের নিজেদের জন্য ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করার কোনো অধিকার নেই।"

অধ্যাপক আহ্মাদ্ আমীন ত্বাবারী থেকে যা উদ্ধৃত করেন তা থেকে তিনি এ উপসংহারে উপনীত হন : 'আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আবূ যারের আকায়েদের মায্দাকের আকায়েদের সাথে খুবই মিল আছে। কিন্তু এ মিল কোত্থেকে এলো?'

আহ্মাদ্ আমীন্ এ প্রশ্ন তুলে ধরেন এবং প্রকৃতই তিনি মনে করেন যে, এ জালীল্ ক্বাদ্র্ সাহাবী মায্দাকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর (মায্দাকের) মতো চিন্তা করতেন। আর তাই তিনি (আহ্মাদ্ আমীন্) নিজেই উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন : "ত্বাবারীও এ

---

[১] *আল্-মাযাহিবুল্ ইস্লামীয়াহ্*, আবূ যুহ্রাহ্, পৃ. ৪৬-৪৭।

প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং এর জবাবে বলেন : আবূ যারের ওপর ইব্‌নুস্‌ সাওদা' (অর্থাৎ ইব্‌নে সাবা') প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইব্‌নুস্‌ সাওদা' অবশ্য আবা দার্‌দা' ও 'উবাদাহ্‌ বিন্‌ সামেত্‌-এর সাথেও সাক্ষাৎ করেছিল, কিন্তু তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। 'উবাদাহ্‌ তাকে (ইব্‌নুস্‌ সাওদা' বা ইব্‌নে সাবা'কে) মুআবিয়ার কাছে নিয়ে যায় এবং বলেন : 'আবূ যার্‌কে যে ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে সে হলো এই ব্যক্তি।"[১]

আহ্‌মাদ্‌ আমীন্‌ তাঁর বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় বলেন : 'আমরা জানি যে, ইব্‌নুস্‌ সাওদা' হচ্ছে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে সাবা'র লক্বব। সে ছিল ইয়াহূদী ও সান্‌'আ-র অধিবাসী– যে উসমানের শাসনামলে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে এবং দ্বীন ইসলামে বিকৃতি সৃষ্টির চেষ্টা করে। সে লোকদের মধ্যে অনেক বিকৃত আকীদা ছড়িয়ে দেয়; এগুলোর মধ্য থেকে আমরা কয়েকটি উল্লেখ করব। সে অনেক বেশি সফর করত– হেজায থেকে বসরা, কুফাহ্‌, শাম ও মিসর। খুবই সম্ভাবনা যে, সে তার আকায়েদ ইরাক বা ইয়ামানের মায্‌দাকীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল। আবূ যার্‌ ধারণা করেন যে, সে সদিচ্ছার অধিকারী, কারণ, তার যিন্দেগী ছিল যাহেদের যিন্দেগী এবং সে বাহ্যত মুত্তাকী ছিল। আবূ যারের দৃষ্টিতে সে ছিল সর্বাধিক মুত্তাকী ও সর্বাধিক যাহেদ ব্যক্তি। ইব্‌নে সাবা' সুফিদের মধ্যে খুবই প্রিয় ব্যক্তি ছিল।'[২]

মুহিব্বুদ্দীন্‌ খাত্বীব

এবার আমরা মুহিব্বুদ্দীন্‌ খাত্বীবের বক্তব্য উদ্ধৃত করার প্রয়োজন অনুভব করছি যা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তিনি পাঠক-পাঠিকাদেরকে মিথ্যা গেলানোর জন্য কীভাবে দৃঢ়তার সাথে তা উপস্থাপন করেছেন! এ ক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠুরতার জন্য ইতিহাসে তুলনাহীন হাজ্জাজ্‌ বিন্‌ ইউসুফের ন্যায় ভূমিকা পালন করেছেন। কারণ, হাজ্জাজ্‌ যেভাবে কোনোরূপ ব্যাখ্যা ও দলিল-প্রমাণ ছাড়াই সাহাবীদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে হামলা চালাতো একইভাবে মুহিব্বুদ্দীন্‌ খাত্বীব্‌ও কোনোরূপ দলিল-প্রমাণ ছাড়াই সত্য ও প্রকৃত বিষয়ের বিরুদ্ধে হামলা চালান এবং স্বীয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মিথ্যাকে আবৃত করার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি ইব্‌নে সাবা'র কল্পকাহিনীকে তাঁর পছন্দনীয় কাঠামোতে ফেলে স্বীয় প্রবৃত্তির লালসার দাবি অনুযায়ী

---

১. *ফাজ্‌রুল্‌ ইস্‌লাম্‌*, ড. আহ্‌মাদ্‌ আমীন্‌, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ১১০।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলেন এবং কোনোরূপ দলিল-প্রমাণ ছাড়াই বিভিন্ন ভিত্তিহীন দাবি প্রচার করেন।

ইব্‌নে সাবা’র নামোল্লেখের পর মুহিব্বুদ্দীন্ খাত্বীব্ বলেন : নোংরা শয়তান ‘আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা’ ছিল সান্‌‘আ-র ইয়াহূদীদের অন্যতম। তার লক্ববৃ ছিল ইব্‌নে সাওদা’ এবং সে তার চিন্তাধারাকে নোংরাসমূহ সহকারে ও ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে প্রবর্তন করছিল, কিন্তু সে খুব বেশি সংখ্যক লোককে তার সহযোগী করতে পারছিল না। সে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের, গোত্রপতিদের ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের সন্তানদের ওপর–যাদের পিতারা জিহাদে শরীক হয়েছিলেন–প্রভাব বিস্তার করে এবং অজ্ঞ মুত্তাকীরা ও একগুঁয়ে গ্বুলূকারীরা তাকে সত্যায়ন করে।

ফুস্‌ত্বাত্বে তার যারা অনুসারী ছিল তাদের মধ্যে কয়েক জন হচ্ছে : গ্বাফেক্বী বিন্ হার্‌ব্ ‘আক্বী, কবি ‘আব্‌দুর্ রাহ্‌মান্ বিন্ ‘আদীস্ বালাভী তাজীবী (যার ক্বলমী নাম বিন্ বাশীর্), সাওদান্ বিন্ হাম্‌রান্, আবদুল্লাহ্ বিন্ যায়দ্ বিন্ ওয়ারাক্বা’, ‘আম্‌র্ বিন্ হামাক্ব খুযা‘ঈ, ‘উর্‌ওয়াহ্ বিন্ নাব্বা‘ লাইছী, ক্বাতীরাহ্ সুকূনী।

কুফায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইব্‌নে সাবা’র প্রতারণার শিকার হয়েছিল তারা হচ্ছে : ‘উমার্ বিন্ আল্-আছ্বেম্, যায়দ্ বিন্ ছূহান্ ‘আব্‌দী, মালেক্ আশ্‌তার্ নাখ্‌‘ঈ, যীয়াদ্ বিন্ নাযার্ হারেছী ও আবদুল্লাহ্ বিন্ আল্-আছ্বেম্।

বসরায় তার অনুসারীদের মধ্যে কয়েক জন হচ্ছে : হার্‌ক্বূছ্ব বিন্ যুহাইর্ সা‘দী, হাকীম্ বিন্ জালাবাহ্ ‘আব্‌দী, যারীহ্ ইবনে ‘ইবাদ্ ‘আব্‌দী, বিশ্‌র্ বিন্ শারীহ্, হাত্বাম্ যাবী‘আহ্ আল্-ক্বায়সী ও ইব্‌নে মুহ্‌রিশ্ বিন্ ‘আব্‌দ্।

কিন্তু মদীনায় সে তিনজনের বেশি লোককে তার সহযোগী করতে সক্ষম হয় নি; এ তিনজন হলো : মুহাম্মাদ্ বিন্ আবী বাক্‌র্, মুহাম্মাদ্ বিন্ আবী হুযাইফাহ্ ও আম্মার্ বিন্ ইয়াসির্।

ইব্‌নে সাবা’ যেসব নোংরা ও প্রতারণামূলক কাজ করে সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, সে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের নামে মিথ্যা পত্র লিখত। উদাহরণস্বরূপ, সে ফুস্‌ত্বাত্বের জনগণের উদ্দেশে আলীর নামে পত্র প্রেরণ করে যাতে লেখা হয় যে, লোকেরা যেন তার সহযোগী হয়, অথবা সে ত্বাল্‌হার পক্ষ থেকে কুফাবাসীদের উদ্দেশে পত্র প্রেরণ করে যাতে তাকে সাহায্য করতে বলা হয়, অথবা সে যুবাইরের

স্বাক্ষর দিয়ে বসরাবাসীদের উদ্দেশে পত্র প্রেরণ করে। পরে বুঝা যায় যে, এসব পত্র ছিল জাল এবং এগুলো ইব্‌নে সাবা'র পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল।

মুহিব্বুদ্দীন খাত্বীব্‌ এরপর মদীনার সাহাবীদের সমালোচনা করেন; তিনি বলেন : মদীনার সাহাবিগণ ও আলীর জন্য এটাই উচিত ছিল যে, ইব্‌নে সাবা'র মিথ্যাসমূহ দেখার পর সচেতন হবেন এবং এ বিষয়টির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেবেন যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যারা সূক্ষ্ম পরিকল্পনা সহকারে ফিতনা সৃষ্টি করতে ও ইসলামের ক্ষতি করতে চায়। ইব্‌নে সাবা'র এ নব ধোঁকা-প্রতারণা দেখতে পাওয়াই মদীনাবাসীদেরকে সচেতন করার জন্য যথেষ্ট ছিল।[১]

ইব্‌নে সাবা' নামক এ কল্পকাহিনীটি এভাবেই অনেক সমকালীন লেখকের মন-মগযকে দখল করে নিয়েছে– যাঁদের মধ্য থেকে অল্প কয়েক জনের কথা ওপরে উল্লেখ করা হলো এবং তাঁদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হলো। এ বিষয়ে আর কোনো দৃষ্টান্ত উল্লেখের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

উপরিউক্ত লেখকগণ যেমন বলেছেন তাতে মনে হয় যে, কথিত ইব্‌নে সাবা' এমন এক ব্যক্তি ছিল যে আবূ যার্‌-কে মুআবিয়ার বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছিল এবং আবূ যার্‌ ধনীদেরকে কোরআন মজীদের যে আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন তা ইসলামের শিক্ষাসমূহের অন্যতম ছিল না (!!!), বরং তা ইব্‌নে সাবা'র শিক্ষাসমূহের অন্যতম ছিল।

মুহিব্বুদ্দীন খাত্বীব্‌ যেসব সাহাবীর নাম ইব্‌নে সাবা'র অনুসারীদের মধ্যে অগ্রগামী হিসেবে উল্লেখ করেছেন–খাত্বীবের ভাষায় যাঁরা ছিলেন অজ্ঞ ও গুলূকারী–তাঁরা ছিলেন আম্মার বিন্‌ ইয়াসির, আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ যায়দ্‌, 'আম্‌র্‌ বিন্‌ হামাক্ব খুযা'ঈ, হাকীম্‌ বিন্‌ জাবালাহ্‌ 'আব্‌দী, যায়দ্‌ বিন্‌ ছুহান্‌, ...।

এভাবে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর খালেস সাহাবীদের ওপর হামলা চালানোর চেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে?! জানি না তাঁদের ওপরে এসব মিথ্যা অপবাদ প্রদানের পিছনে কী কারণ নিহিত রয়েছে এবং এর সপক্ষে কী দলিল-প্রমাণ রয়েছে। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে একটি তথ্যসূত্রের অস্তিত্ব আছে, তা হচ্ছে ত্বাবারীর উক্তি। অবশ্য ত্বাবারীর উক্তির ওপর মুহিব্বুদ্দীন খাত্বীব্‌ বিশেষ বিশেষ শর্তসাপেক্ষে

---

[১] *হাম্‌লাতু রিসালাতিল্‌ ইস্‌লাম্‌*, মুহিব্বুদ্দীন্‌ খাত্বীব, পৃ. ২৩-২৪।

ব্যতীত আস্থা রাখেন না, কিন্তু যেহেতু ইব্‌নে সাবা'র ক্ষেত্রে ত্বাবারীর উক্তি মুহিব্বুদদীন খাত্বীবের পছন্দ মোতাবেক একটি কল্পকাহিনী সেহেতু তিনি কোনো রকমের শর্ত ও বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই সেটি গ্রহণ করে নিয়েছেন।

কোথা থেকে এবং কোন্ পর্যন্ত?

প্রাচ্যবিদ ও অপ্রাচ্যবিদ নির্বিশেষে অনেক লেখকের কাছেই ইব্‌নে সাবা'র কল্পকাহিনী একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ কাহিনী এবং এ কারণে তাঁরা এটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাই তাঁরা এ কল্পকাহিনীটিকে এমনভাবে উল্লেখ করেন যেন এটি একটি অকাট্য ঐতিহাসিক ঘটনা– যার সত্যতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁদের এ মানসিকতা ও আচরণের কারণেই তাঁরা এ কাহিনীটি যথার্থ কি অযথার্থ সে সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করতে মোটেই প্রস্তুত নন। এ কল্পকাহিনী কোথা থেকে ও কীভাবে উৎসারিত হলো সে ব্যাপারে তাঁদের মোটেই মাথাব্যথা নেই। তেমনি এ ধরনের একটি কল্পকাহিনীর পুনরাবৃত্তির অনিবার্য পরিণতি কী হতে পারে তা নিয়েও তাঁদের কোনো ভাবনা নেই।

এ কল্পকাহিনীতে যেরূপ বলা হয়েছে, ইব্‌নে সাবা' মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিভেদের আগুন প্রজ্বলিত করে এবং সে এমন একটি মায্‌হাবের ভিত্তি স্থাপন করে বর্তমানে দশ কোটিরও বেশি[১] সংখ্যক মুসলমান যে মায্‌হাবে বিশ্বাসী।[২] সে তার আকায়েদ প্রথমে মিসরে প্রবর্তন করে এবং সেখানে সে তার আশা-আকাঙ্ক্ষায় উপনীত হতে সক্ষম হয়। সে মুসলমানদের খলীফা উসমানের পতন ঘটাবার জন্য মিসরের একদল লোককে নিয়ে মুসলমানদের রাজধানী মদীনায় পৌঁছে যায় এবং তার লক্ষ্য হাসিল করতে সক্ষম হয়।

এ কল্পকাহিনী অনুযায়ী, যে সাহাবীর সত্যবাদিতাকে স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) সত্যায়ন করেছেন সেই সাহাবীর ওপর অর্থাৎ আবূ যারের ওপর ইব্‌নে সাবা' প্রভাব বিস্তার করে এবং তাঁকে মুআবিয়ার বিরুদ্ধে উস্কে দেয়, কারণ, মুআবিয়া প্রচুর ধনরত্ন পুঞ্জীভূত করেছিলেন, আর এই ইব্‌নে সাবা'ই আবূ যারের অন্তরে মায্‌দাকী

---

[১] গ্রন্থটি রচনাকালীন সংখ্যা।– বাংলা অনুবাদক

[২] *আশ্-শী'আতু ফীল্ মীযান্*, পৃ. ৪৪৫।

চিন্তাধারা বপন করে দেয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আরো বহু শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়।

এগুলো হচ্ছে ইব্‌নে সাবা' নামক কাল্পনিক ব্যক্তির প্রতি আরোপকৃত কার্যকলাপের অংশবিশেষ। আমরা জানি না এ ধরনের অতিশয়োক্তিমূলক দাবিগুলো কোথায় গিয়ে উপনীত হতে পারে। কারণ, গোটা ইতিহাসে এ কল্পকাহিনীর সাথে অনবরত অনেক কিছু যোগ হয়েছে এবং কোনো রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এ বিষয়ে কলম চালানো হয়েছে; এখনো চালানো হচ্ছে। আমরা জানি না শেষ পর্যন্ত বিষয়টা কোথায় গিয়ে ঠেকবে!

বস্তুত যে কোনো ইতিহাসবেত্তার উচিত নিজেকে প্রশ্ন করা : এ গল্পের উৎস কী? প্রথম বারের মতো যে লেখকগণ এ কাহিনী লিখেছেন তাঁরা তা কোথা থেকে পেয়েছিলেন বা নিয়েছিলেন? এ কাহিনী কি মুতাওয়াতির্ সূত্র থেকে নেয়া হয়েছিল– যে পর্যায়ের হলে তার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব?

এরূপ ধারণা হতে পারে যে, যেহেতু এ কাহিনীটি খুবই বিখ্যাত কাহিনী সেহেতু অবশ্যই এর পিছনে মযবূত্ সনদের উপস্থিতি থেকে থাকবে। কারণ, বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে এ কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, এ কাহিনীটি আদৌ কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে গ্রহণ করা হয় নি। ইন্ শাাআল্লাাহ্, অচিরেই আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

এমনকি এ কল্পকাহিনীর মূল সূত্র ও সনদের বিষয়টি যদি আমরা উপেক্ষা করি তথাপি সুস্থ বিচারবুদ্ধি এটিকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, এ গল্পের মধ্যে বহু স্ববিরোধিতা বিদ্যমান রয়েছে এবং অকাট্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সাথে এর সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি নেই। সুতরাং গবেষকগণ ও ঐতিহাসিকগণের জন্য এ গল্পের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অপরিহার্য। বস্তুত যে কোনো 'ইল্‌মী গবেষণার জন্যই এটা অবশ্য কর্তব্য। বিশেষ করে এ বিষয়টির ক্ষেত্রে সত্য উদ্ঘাটন করা খুবই জরুরি। নচেৎ এ গল্পটিকে এভাবে গ্রহণ করলে তা মুসলমানদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হতে বাধ্য। কারণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা ছাড়াই অন্ধভাবে এ ধরনের একটি কল্পকাহিনীকে মেনে নিলে সে কাজটি হবে সেই চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায় যেগুলো কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এমন এক ব্যক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার

পিছনে পথ চলতে থাকে ও চোখ-কান বন্ধ করে তার নির্দেশ মেনে চলতে থাকে যাকে তারা চেনে না। (!) কারণ, এ কল্পকাহিনীতে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর বহু শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে ও ইসলামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী বহু ত্বাবে'ঈ-কে নির্বোধরূপে তুলে ধরা হয়েছে– যারা এমন একজন বহিরাগত লোকের ডাকে সাড়া দিয়ে তার পিছনে পথ চলেছিলেন যে ব্যক্তি শির্ক্ ও নাস্তিকতার আহ্বানকারী ছিল।

অন্যদিকে, বর্ণিত কল্পকাহিনীতে দেখা যায়, মিসরের জনগণ ব্যতীত অন্য কোনো জায়গার জনগণ ইব্নে সাবা'র আহ্বানে সাড়া দেয় নি। যেভাবে বলা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, মিসরীয়রা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ইব্নে সাবা'র দিকে ঝুঁকে পড়ে। অথচ সে কোনো সুপরিচিত ব্যক্তি ছিল না এবং সে লোকদেরকে কোনো মামূলী কাজের দিকে আহ্বান করে নি। বরং, কল্পকাহিনীর বর্ণনা অনুযায়ী, সে লোকদেরকে খলীফার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কী করে সম্ভব হলো যে, মিসরের জনগণ এ নবাগত বিদেশী লোকটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার পিছনে ঐক্যবদ্ধ হলো এবং তার নেতৃত্বে হুকূমাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল? এ বিষয়টি কি কোনো সাধারণ বিষয় এবং মানুষের সুস্থ বিচারবুদ্ধি কি এটা সম্ভব হওয়া বলে মনে করে? আচ্ছা, মিসরে কি সুস্থ বিচারবুদ্ধির অধিকারী একটি লোকও ছিলেন না যিনি লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে পারতেন? নাকি মিসরের সমস্ত মানুষই নির্বোধ ও নাদান ছিল? মিসরীয়রা এভাবে দ্রুত ইব্নে সাবা'র আহ্বানে সাড়া দেবে ও তার পিছনে পিছনে চলতে শুরু করবে এটা সুস্থ বিচারবুদ্ধি স্বীকার করে না এবং এটা যুক্তিসঙ্গতও নয়, যখন তাদের মধ্যে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর এমন অনেক সাহাবী ছিলেন যাঁরা বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

ড. ত্বাহা হুসাইন্ যা বলেন

ড, ত্বাহা হুসাইন্ তাঁর *আল্-ফিত্নাতুল্ কুব্রা* গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে ইব্নে সাবা'র কল্পকাহিনী সম্পর্কে বলেন : 'এ হচ্ছে এমন একটি কাহিনী পরবর্তীকালীন (মুতাআখ্খির্) রাভিগণ যার ওপরে খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এটিকে এতোই বড় করে তুলেছেন যে, উসমানের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের পিছনে নিহিত কারণ হিসেবে এটাকে গণ্য করা হয়েছে। আর এ কাহিনীটি মুসলমানদের মধ্যে যে বিভেদ তৈরি করেছে তা এমনই গভীর যে, তার প্রভাব আজো পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

এ কাহিনীটি হচ্ছে ইব্‌নে সাবা'র কাহিনী– যা ইব্‌নে সাওদা'র কাহিনী নামে পরিচিত।'

'তার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ ও রাভিগণ যা বলেন তা হচ্ছে : আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা' ছিল ইয়াহূদী ও সান্'আ-র অধিবাসী। তার মা ছিল হাব্‌শী এবং সে উসমানের শাসনামলে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সে বিভিন্ন শহরে সফর করে খলীফার বিরুদ্ধে প্রচার করে এবং লোকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দেয়। সে লোকদের মধ্যে তার বিকৃত মত ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং তাদের দ্বীন ও রাজনৈতিক নীতিসমূহকে ধ্বংস করে দেয়।'

'উসমানের যুগে যেসব সমস্যা ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তার অনেক কিছুকেই তার প্রতি আরোপ করা হয় এবং কেউ কেউ বলেন যে, যথাযথ পরিস্থিতি তৈরি হলে খলীফার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করবে ও তাঁকে হত্যা করবে এ লক্ষ্যে সে বিভিন্ন শহরে ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যে গোপন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল।'

ত্বাহা হুসাইন্ তাঁর আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলেন : 'যারা ইব্‌নে সাবা'কে এতো বড় করে দেখিয়েছেন তাঁরা যেমন ইতিহাসের প্রতি তেমনি তাঁদের নিজেদের প্রতিও যুলুম করেছেন। কিন্তু যেসব গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থে উসমানের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেসব গ্রন্থে আমরা ইব্‌নে সাবা'র নামগন্ধও দেখতে পাই না। ইব্‌নে সাবা' ও উসমানের ঘটনায় তার হস্তক্ষেপ সম্পর্কে ইব্‌নে সা'দ্ কিছুই উল্লেখ করেন নি। তেমনি বালাযুরী তাঁর *আন্‌সাাবুল্ আশ্‌রাাফ্* গ্রন্থে ইব্‌নে সাবা'র নামোল্লেখ করেন নি, অথচ অনেকে এ গ্রন্থটিকে এ কাহিনীর তথ্যসূত্র হিসেবে গণ্য করেছেন। অবশ্য ত্বাবারী সাইফ্ বিন্ 'উমার্-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্‌নে সাবা'র কাহিনী উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক দৃশ্যত তাঁর কাছ থেকে এ কাহিনীটি গ্রহণ করেছেন।'

'উসমানের ঘটনায় ইব্‌নে সাবা'র কোনো ভূমিকা ছিল কিনা জানি না। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, (যদি তার কোনো ভূমিকা থেকেও থাকে তো) তার ভূমিকা যতখানি বলা হয় ততখানি ছিল না। এটা একেবারেই অসম্ভব যে, মুসলমানরা নতুন ইসলাম গ্রহণকারী এমন একজন লোককে গ্রহণ করে নেবে যে তাদের খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।'

'ইব্‌নে সাবা'র ক্ষেত্রে আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, বলা হয়, আবূ যার তাঁর বিপ্লবী আকায়েদ তার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তারই উস্কানিতে তিনি মুআবিয়ার সমালোচনা করেন; আবূ যার্-কে ইব্‌নে সাবা' শিক্ষা দেয় যে, তিনি যেন 'সম্পদ আল্লাহ্‌র সম্পদ' না বলে 'সম্পদ মুসলমানদের সম্পদ' বলেন, আর আবূ যারের সমালোচনা ধনীদের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা তার উস্কানিরই ফল ছিল।'

'যারা ধারণা করেন যে, আবূ যারের সাথে ইব্‌নে সাবা'র যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল এবং সে তাঁর ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তারা আবূ যারের ওপর যুলুম করছেন এবং ইব্‌নে সাবা'কে অনেক ওপরে তুলে দিচ্ছেন।'

"বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ যার্ শাম্ থেকে (মদীনায়) ফিরে আসার পর একদিন উসমানকে বলেন : 'যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত দিয়েছে এমন কেউ হয়তো একেই যথেষ্ট মনে করতে পারে এবং অভাবী লোকদেরকে আর সাহায্য না করতে পারে ও 'ইন্‌ফাক্ব' ছেড়ে দিতে পারে।' তখন সেখানে কা'বুল্ আহ্‌বার্ উপস্থিত ছিলেন; তিনি বললেন : 'কেউ যদি ফরয পরিমাণ আমল করে তার জন্য তা-ই যথেষ্ট।' এতে আবূ যার্ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং কা'বের উদ্দেশে বলেন : 'ওহে ইয়াহূদী নারীর সন্তান! তোমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য কী?! তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে চাও?' এ কথা বলে তিনি তাঁর লাঠি নিয়ে কা'বের ওপর আক্রমণ চালান। যে আবূ যার্ এভাবে কা'বের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, যদিও (কথিত) ইব্‌নে সাবা'র বহু আগে কা'ব্ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মদীনার উপকণ্ঠে জীবন যাপন করতেন, সেই আবূ যারের পক্ষে ইব্‌নে সাবা'র অনুসারী হওয়া কী করে সম্ভবপর?"

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা' সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি যা বলা যেতে পারে তা হচ্ছে–তার সম্পর্কে যা বলা হয় তা যদি সঠিক হয়ে থাকে–উসমানের যুগে বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে যে ফিতনা ও অনৈক্য সৃষ্টি হয় তা উদ্ভূত হওয়ার পর সে তার অপব্যবহার করে এবং শিয়াদের সাথে উমাইয়াদের ও আব্বাসীদের সংঘাতের কারণে ইব্‌নে সাবা' সম্পর্কে অতিশয়োক্তি (গুলূ) করা হয়েছে এবং তার ভূমিকাকে অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে। কারণ, একদিকে শিয়ারা উসমানের ও তাঁর মনোনীত ওয়ালিগণের দোষ ধরছিল, অন্যদিকে শিয়াদের বিরোধীরা এ মাযহাবকে প্রত্যাখ্যান করানোর

লক্ষ্যে ইব্‌নে সাবা'কে টেনে নিয়ে আসে যাতে বলতে পারে যে, শিয়া মাযহাব তার তৈরি মাযহাব।'

ড. ত্বাহা হুসাইন্ তাঁর আলোচনার উপসংহারে বলেন : 'ইব্‌নে সাবা' সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়ে থাকে তা বিচারবুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এটা আদৌ 'ইল্‌মী সমালোচনার উপযুক্ত কোনো বিষয় নয় এবং এ কিচ্ছা কোনো কথার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়।'[1]

মদীনা মুনাওয়ারাহ্ ও আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা'

এ প্রসঙ্গে এবার আমরা ইসলামি হুকূমাতের প্রথম রাজধানী মদীনা মুনাওয়ারাহ্ সম্পর্কে কিছু কথা বলব।

আলোচ্য সময়ে মদীনায় মুহাজির ও আনসারগণ একত্রে বসবাস করছিলেন এবং তাঁদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন হযরত ইমাম আলী (আ.); তাঁরা ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দেন এবং বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় এটা কী করে সম্ভব যে, তাঁরা খুব সহজেই কথিত ইব্‌নে সাবা'র বাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করবেন এবং ইব্‌নে সাবা' কোনোরূপ সমস্যা মোকাবিলা করা ছাড়াই মিসর থেকে এসে মদীনা দখল করে ফেলবে ও খলীফার পতন ঘটাবে, অথচ মদীনাবাসীরা 'টু' শব্দটিও করবেন না?!

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ছিল এ থেকে ভিন্ন কিছু। খলীফার বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান কেবল মিসরেই ঘটে নি এবং এর নেতৃত্বও কথিত ইব্‌নে সাবা' প্রদান করে নি। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এ নামের কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব বাস্তবে আদৌ ছিল না। বরং মদীনাই ছিল খলীফার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কেন্দ্রস্থল। ঐ সময় সমগ্র ইসলামি ভূখণ্ডের জনগণই খলীফার ওয়ালিগণের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং এ অবস্থা মদীনায় ছিল তীব্রতর, কারণ, মদীনার জনগণ মার্‌ওয়ানের মুখোমুখি ছিলেন। সাহাবিগণ সরকারি কাজকর্মের সংশোধনের জন্য এবং সম্ভাব্য যে কোনো অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য খলীফাকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন; আর এ হচ্ছে এমন একটি বিষয় ঐতিহাসিকগণ যা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

---

[1] *আল্-ফিত্‌নাতুল্ কুব্‌রা*, ড. ত্বাহা হুসাইন্, পৃ. ১৩৪।

আহ্মাদ্ আমীন্ তাঁর সর্বসাম্প্রতিক গ্রন্থ *ইয়াওমুল্ ইসলাম্*-এ বলেন : ‘উসমান তাঁর খেলাফতের প্রথম ছয় বছর ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় ছয় বছরে বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর কর্মক্ষমতা কমে যায় এবং তিনি উমাইয়া গোত্রের লোকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। তখন কার্যত সরকারি কাজকর্ম উমাইয়াহ্ বংশের মার্ওয়ান্ ইব্নে হাকামের হাতে ছিল, ...। এ বিষয়টি অনেক সাহাবীকেই, বিশেষ করে আলী, যুবাইর্ ও ত্বাল্হাহ্কে ক্রুদ্ধ করে তোলে, ...। প্রথম দিকে তাঁরা খলীফাকে উমাইয়াহ্দের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন এবং তাঁকে দুর্নীতিপরায়ণ ওয়ালিগণকে পদচ্যুত করার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু উসমান নতি স্বীকার করেন নি। ফলে পরিস্থিতি একই রকম অব্যাহত থাকে। আর এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত মদীনায় স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত উসমানকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকারী কেউই ছিলেন না। উসমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠোরতম বিরোধীদের মধ্যে ছিলেন আবূ বাক্রের কন্যা আয়েশা– যিনি লোকদেরকে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেন।’

‘মোট কথা, উসমানের বিরোধীরা সকলে মিলে বিভিন্ন শহরে তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান উস্কে দিতে সক্ষম হন। মদীনাবাসীরা তাঁর গৃহকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন এবং সেখানে গমনাগমন বন্ধ করে দেন। মিসরীয়রাও যখন বুঝতে পারল যে, মিসরে নিয়োজিত উসমানের ওয়ালী আবদুল্লাহ্ বিন্ আবী সারাহ্কে লেখা উসমানের পত্রে লেখা হয়েছে যে, মিসরের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা মিসরে ফিরে যাবার পর যেন তাঁদেরকে শাস্তি দেয়া হয়, তখন তারা উসমানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে।”[১]

আহ্মাদ্ আমীন্ তাঁর আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলেন : ‘উসমানবিরোধী গণবিদ্রোহের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এগুলো : আবদুল্লাহ্ বিন্ খালেদ্ বিন্ আসিয়াহ্ উমাভী উসমানের কাছে উপহার চায় এবং উসমান তাকে চার লক্ষ দেরহাম প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাকাম্ বিন্ আবীল্ ‘আস-কে নির্বাসিত করেছিলেন, কিন্তু উসমান তাকে মদীনায় ফিরিয়ে আনেন এবং তাকে এক লক্ষ দেরহাম প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনার বাজারের একটি মহল্লা সকল মুসলমানের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু উসমান ঐ জায়গাটি হারেছ্ বিন্ হাকাম-কে প্রদান করেন। অন্যদিকে ফাদাক্ ছিল ফাতেমা (সালামুল্লাাহি ‘আলাইহা)-র সম্পত্তি এবং রাসূলুল্লাহ্

---

১. *ইয়াওমুল্ ইস্লাম্*, আহ্মাদ্ আমীন্, পৃ. ৫৭।

(সা.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি তা দাবি করেছিলেন, উসমান সেটি মার্‌ওয়ান্-কে প্রদান করেন। এছাড়া তিনি মদীনার আশেপাশের চারণ ভূমিগুলোতে (যা ছিল জনগণের সম্পদ) বানী উমাইয়ার লোক ছাড়া অন্যান্য জনগণের পশু চরানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ত্বারাব্‌লুস্ (ত্রিপোলী) থেকে ত্বান্‌জাহ্ পর্যন্ত জায়গা– যা তাঁর শাসনামলে বিজিত হয়েছিল– তিনি আবদুল্লাহ্ বিন্ আবী সারাহ্‌কে প্রদান করেন। তিনি বায়তুল মাল থেকে আবূ সুফীয়ানকে দুই লক্ষ দের্‌হাম্ প্রদান করেন এবং যেদিন তা প্রদান করেন সেদিনই তার জামাতা মার্‌ওয়ানকে এক লক্ষ দের্‌হাম্ প্রদান করেন। এ সব কারণে তখনকার রাষ্ট্রীয় কোষাধ্যক্ষ যায়দ বিন্ আর্‌ক্বাম উসমানের কাছে এসে ক্রন্দন করেন। উসমান তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : 'আমি যে আমার আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করছি তাতে কি আপনি অসন্তুষ্ট?' যায়দ্ বললেন : 'না। আমি এ কারণে কাঁদছি যে, আমি ধারণা করেছিলাম যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যামানায় আল্লাহ্‌র পথে যে ব্যয় করেছিলেন তার বিনিময়ে এ সম্পদ হস্তগত করেছেন। কিন্তু আমি ভুল ধারণা করেছিলাম। আল্লাহ্‌র শপথ, আপনি যদি মার্‌ওয়ানকে একশ' দের্‌হাম্-ও প্রদান করেন তো তা-ও তার জন্য বেশি।' তখন উসমান তাঁকে বললেন : 'কোষাগারের (বায়তুল মাালের) চাবি ফেরত দিন; আপনি ব্যতীত অন্য কাউকে কোষাধ্যক্ষ হতে হবে।'

'আবূ মূসা আশ্‘আরী ইরাক থেকে প্রচুর অর্থ ও মালামাল মদীনায় প্রেরণ করেন এবং উসমান তার সবই বানী উমাইয়ার লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। হারেছ্ বিন্ হাকাম যখন বিবাহ করে তখন উসমান বাইতুল মাল হতে তাকে এক লক্ষ দেরহাম প্রদান করেন। মুআবিয়া কর্তৃক সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের সমালোচনা করার কারণে আবূ যার্-কে তিনি (উসমান) রাবাযায় নির্বাসিত করেন। আর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস্‘উদ্-কে এতোই প্রহার করেন যে, এর ফলে তাঁর পঞ্জরাস্থিগুলো ভেঙে যায়। উমার্ ইসলামের শাস্তি আইন (হুদূদ) কার্যকরকরণ, মযলূমদের হক প্রত্যর্পণ ও সুবিচারক ওয়ালিগণকে নিয়োগের যে নীতি অনুসরণ করতেন তিনি (উসমান) তা অনুসরণ করা হতে বিরত থাকেন।'[১]

মোট কথা, গণঅভ্যুত্থান মদীনা থেকে শুরু হয় এবং বিরাট সংখ্যক সাহাবী হুকূমাতের অবস্থা–উমাইয়ারা যা কলুষিত করে ফেলেছিল–সংশোধনের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁরা

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।

বিভিন্ন শহরে পত্র প্রেরণ করেন যাতে তাঁরা লোকদেরকে বলেন যে, তোমরা যদি অভ্যুত্থান করতে চাও তাহলে এখনি উঠে দাঁড়াও, কারণ, খলীফা মুহাম্মাদ (সা.)-এর দ্বীনকে ধ্বংস করে ফেলছেন।[1]

তথ্যসূত্রসমূহের পর্যালোচনা

এখানে আমরা ইব্‌নে সাবা'র কল্পকাহিনীর তথ্যসূত্রসমূহ নিয়েও আলোচনা করতে চাই যাতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যেসব লেখক ও গ্রন্থকার এ কল্পকাহিনীটি বর্ণনা করেছেন তাঁরা কী ধরনের তথ্যসূত্র থেকে এটি গ্রহণ করেছেন।

আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, কতক লেখক এ ইব্‌নে সাবা'র কিচ্ছার সত্যতায় সন্দেহ পোষণ করেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের সন্দেহের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন না। কারণ, তাঁরা ধারণা করেন যে, এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে উদ্ধৃতি রয়েছে এবং তাঁরা এটিকেই এ কাহিনীর সত্যতার নিদর্শন বলে গণ্য করেছেন, যদিও তাঁরা ইব্‌নে সাবা' সম্পর্কিত অতিশয়োক্তিগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্যদিকে কেউ কেউ দৃঢ়তার সাথে এ কাহিনীকে সত্য বলে দাবি করেছেন। কারণ, এ ঘটনার বর্ণনাকারী এমন এক ব্যক্তি তির্‌মিযী যার বর্ণিত হাদিস স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।[2] এ সব মতপার্থক্যের কারণে অনেকের কাছেই বিষয়টি গোলমেলে বলে মনে হয়।

ড. যীয়াউদ্দীন্ আর্-রাইস্ তাঁর গ্রন্থে বলেন : 'কতক লেখক খোদ্ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা' নামক কোনো ব্যক্তির অস্তিত্বেই সন্দেহ পোষণ করেছেন। কিন্তু তার সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়াইয়াত্ ও আখ্‌বার্ থাকায় এবং নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণের উদ্ধৃতিসমূহের তাওয়াতুর ইতিহাসে এরূপ ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বের স্বীকৃতি লাভের কারণ হয়েছে। যদিও তার সম্পর্কে অনেক অতিশয়োক্তি করা হয়েছে এবং ফলত উসমানের শাসনামলে সংঘটিত যে কোনো ঘটনাকেই তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।'[3]

---

[1] *আন্‌সাবুল্ আশ্‌রাফ্*, বালাযুরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০; *আল্-কামিল্ ফীত্-তারীখ্*, ইব্‌নে আছীর্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮; *তারীখে ত্বাবারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৬।

[2] *সাহীহ্ তির্‌মিযী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৯৭, হাদিস নং ৩৮৬৬।

[3] *আন্-নাযারীয়াতুস্ সীয়াসীয়াতুল্ ইস্‌লামীয়াহ্*, মুহাম্মাদ্ যীয়াউদ্দীন্ আর্-রাইস্, পৃ. ৪১।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ড. যীয়াউদ্দীন্ আর্-রাইস্-ও সেই ব্যক্তিদের অন্যতম যাঁরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা'র কল্পকাহিনী সম্পর্কে ভুলের শিকার হয়েছেন। তিনি ধারণা করেছেন যে, ইব্‌নে সাবা'র কাহিনীর ব্যাপারে মুতাওয়াতির বর্ণনা রয়েছে, কারণ, বিভিন্ন গ্রন্থে এ কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা'র ব্যাপারে যে অতিশয়োক্তি আছে তিনি তা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন নি এবং তা যে বিচারবুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য নয় সে ব্যাপারে আভাস দিয়েছেন। যদিও বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রের বর্ণনার কারণে তিনি এ নামের একজন ব্যক্তির অস্তিত্বের মূল বিষয়টি গ্রহণ করে নিয়েছেন, নচেৎ এটা পুরোপুরি সুস্পষ্ট যে, 'আকলী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা' নামক কোনো ব্যক্তির অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহের কারণ রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ড. রাইস্ মূল বিষয়টি সম্পর্কে আরো বেশি পর্যালোচনা করার পরিবর্তে অন্যদের মতামতের ভিত্তিতে মূল বিষয়টি সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন। আর এটা এমন একটা কাজ যা 'ইল্‌মী গবেষণার ক্ষেত্রে আদৌ হওয়া উচিত নয়।

এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে যে কোনো গবেষকের জন্যই যা প্রয়োজন তা হচ্ছে যথেষ্ট সময় নিয়ে গবেষণা করতে হবে এবং বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিখুঁতভাবে ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ, এ বিষয়টি সম্পর্কিত গবেষণা থেকে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তার যেমন দ্বীনী ক্ষেত্রে প্রভাব বর্তাবে, তেমনি সামাজিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বর্তাবে। এ কারণেই আমরা মনে করি যে, গোটা ইতিহাসে এ কাহিনীর যেসব তথ্যসূত্র পাওয়া যায় সেগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করা অপরিহার্য।

সর্বপ্রথম যিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা'র কথা লিখেছেন তিনি হলেন মুহাম্মাদ্ বিন্ জারীর্ ত্বাবারী (ওফাত ৩১০ হিজরি)– যিনি *আত্-তাফ্‌সীরুল্ কাবীর্*ও *তারীখুল্ উমাম্ ওয়াল্-মুলূক্* (যা *তারীখে ত্বাবারী* নামে সমধিক পরিচিত)-এর ন্যায় বিখ্যাত গ্রন্থাবলির প্রণেতা। ইব্‌নে আছীর্ (ওফাত ৬৩০ হিজরি), ইব্‌নে কাছীর্ (ওফাত ৭৭৪ হিজরি), ইব্‌নে খাল্‌দূন (ওফাত ৮০৮ হিজরি) প্রমুখ এবং পরবর্তীকালে আরো যাঁরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা' সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ত্বাবারী থেকে গ্রহণ করেছেন এবং স্বয়ং ত্বাবারী ইব্‌নে সাবা'র কাহিনী ও উসমানের

শাসনামলের ঘটনাবলি সাইফ্ বিন্ ‘উমার্ নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে–যে হারূনুর্ রাশীদের শাসনামলে মারা যায়–উদ্ধৃত করেছেন।

এ ধরনের একটি মিথ্যা কল্পকাহিনী উল্লেখ করার কারণে আমরা এখানে ত্বাবারীর ও তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের সমালোচনা করতে চাই না। কারণ, তিনি ছিলেন ইতিহাসবেত্তা এবং তিনি যা কিছু শুনেছেন বা পড়েছেন তা-ই উদ্ধৃত করেছেন এবং সেসবের বিচার-বিশ্লেষণের ভার পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি নিজেও তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : ‘হতে পারে যে, এ গ্রন্থে পাঠক এমন কতক বিষয় পড়বেন যেগুলো তাঁর খুব একটা ভালো লাগবে না, কারণ, তাঁর দৃষ্টিতে সেগুলো সঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের বিষয়গুলো আমার নিজের পক্ষ থেকে নয়, আমার কাছে যেগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে আমি কেবল সেগুলো উদ্ধৃত করছি মাত্র।’[১]

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্বয়ং ত্বাবারী যা কিছু লিখেছেন তার সবকিছুকেই সত্য বলে দাবি করেন নি এবং তিনি তাঁর পরবর্তীকালীন গবেষকদের জন্য তাঁর লিখিত সবকিছুর সমালোচনা ও পর্যালোচনার দরজা উন্মুক্ত রেখে গিয়েছেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি তাঁর গ্রন্থে একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী দু’টি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তার দু’টিই সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্র ব্যতীত তিনি পরস্পরবিরোধী দু’টি উদ্ধৃতির সমালোচনা ও পর্যালোচনা করেন নি বা একটির ওপরে অপরটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন নি, বরং কোনো একটিকে সঠিক হিসেবে গণ্য করার ও অপরটিকে প্রত্যাখ্যানের ভার তিনি পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে ত্বাবারী ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক ও ফক্বীহ্ আলেম– যিনি তাঁর পুরো সময় জ্ঞানচর্চায় বিনিয়োজিত করেছিলেন। তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের বিষয়গুলো কীভাবে সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন তা তাঁর এ গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন; তিনি বলেন যে, বিভিন্ন উক্তি ও বর্ণনা তাঁর কাছে যেভাবে পৌঁছেছে তিনি ঠিক সেভাবে সেগুলো উদ্ধৃত করেছেন যাতে পাঠক ধারণা না করেন যে, তিনি যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোর সবগুলোকেই সঠিক বলে দাবি করছেন। তিনি তাঁর উদ্ধৃতিসমূহের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি– যাতে পাঠক তাঁর ‘ইল্‌মী

---

[১] *তারীখে ত্বাবারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫।

পক্ষপুটে বন্দি হয়ে না পড়েন। এমনকি তিনি এটাও চান নি যে, পাঠক যেন খুব বেশি গুরুত্ব সহকারে তাঁর গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

তারীখে ত্বাবারী ও আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা’

মুহিব্বুদ্দীন খাত্বীব্ কীভাবে *তারীখে ত্বাবারী* থেকে সাহায্য নিয়েছেন সে সম্পর্কে তিনি স্বয়ং কিছু কথা বলেছেন; তাতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় রয়েছে বিধায় এখানে তা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেন : ‘*তারীখে ত্বাবারী* থেকে কেবল এমন কারো পক্ষেই সাহায্য নেয়া সম্ভবপর যিনি ত্বাবারী যেসব রাভী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবেন। সরাসরি যারা ত্বাবারীর শায়খ্ (শিক্ষক) তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে ও তাঁর শায়খ্‌গণের শায়খ্‌গণের অবস্থা সম্পর্কে যাহাবীর *তায্‌কিরাতুল্ হুফ্‌ফায্* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর (ত্বাবারীর) হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর রাভীগণ সম্বন্ধে রিজাল্‌শাস্ত্র সম্বন্ধীয় ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলিতে, যেমন : ছ্বাফী খায্‌রাজী প্রণীত *খুলাছ্বাতু তাহ্‌যীবুল্ কামাল্* ও হাফেয্ ইব্‌নে হাজার্-এর *তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব্*-এ উল্লিখিত হয়েছে। তেমনি কতক গ্রন্থে যা‘ঈফ্ রাভিগণের জার্‌হ্ (নেতিবাচক সমালোচনা) করা হয়েছে – যেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে : যাহাবী প্রণীত *মীযানুল্ ই‘তিদাল্*, ইব্‌নে সা‘দ্ প্রণীত *ত্বাবাক্বাত্*, খাত্বীব্ প্রণীত *তারীখে বাগ্বদাদ্*, ইবনে ‘আসাকির্-এর *তারিখে দামিশ্‌ক্ব্*, যাহাবী-র *তারীখুল্ ইস্‌লাম্*, ইব্‌নে কাছীরের *আল্-বিদাইয়াহ্ ওয়ান্-নিহাইয়াহ্*।

‘অনুরূপভাবে, একজন রাভীর রেওয়াইয়াতসমূহের ওপর আস্থা স্থাপনের জন্য যেসব শর্ত অপরিহার্য, হাদিসের ও রিজাল্‌শাস্ত্রের গ্রন্থাবলিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ শর্তগুলো প্রয়োগ করে ত্বাবারীর রাভিগণ বা অন্য যে কোনো গ্রন্থের রাভিগণের উদ্ধৃতিসমূহের সত্যতা বা মিথ্যা হওয়া সম্পর্কে জানা যেতে পারে। যে কেউ ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করতে চান তাঁর পক্ষে এ কাজ আঞ্জাম দেয়া অপরিহার্য। এ সবই সেই সব আলেমের কাছে ঋণী যাঁরা নিখুঁতভাবে হাদিসসমূহ ও রাভিগণের স্তর বিভাগ ও পর্যালোচনার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এ হচ্ছে এমন একটি কাজ যা মুসলিম আলেমগণ ব্যতীত অন্যদের মধ্যে দেখি নি, ...। কিন্তু যাঁরা ঐতিহাসিক বর্ণনা ও উদ্ধৃতিসমূহকে কেবল স্বীয় পছন্দ ও রুচির ভিত্তিতে উদ্ধৃত

করেন এবং তার রাভী ও তার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে মাথা ঘামান না; বরং তাঁদের দৃষ্টিতে রেওয়াইয়াতসমূহ ত্বাবারীর বা অন্য কোনো আলেমের গ্রন্থে রয়েছে এ দলিল উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট গণ্য করেন তাঁদের পক্ষে ইতিহাসের গ্রন্থাবলি থেকে যথাযথ সুফল লাভ করা সম্ভব নয় এবং তাঁদের কথার ওপরে আস্থা রাখা সম্ভব নয়। এ ধরনের ব্যক্তিরা যদি ইসলামের ইতিহাসের পরিবেশে যিন্দেগী যাপন করতে চান তাহলে তাঁদেরকে জার্হ্ ও তা'দীলের (রাভীদের সমালোচনা ও বিশ্লেষণমূলক) গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করতে হবে, কেবল তাহলেই তাঁদের পক্ষে সত্য তথ্যকে মিথ্যা তথ্য থেকে এবং নির্ভরযোগ্য রাভীকে অনির্ভরযোগ্য রাভী থেকে আলাদা করে চেনা সম্ভব হবে।'[১]

এবার আমরা স্বয়ং মুহিব্বুদ্দীন খাত্বীব্কে প্রশ্ন করতে পারি যে, তিনি নিজে কি ইব্নে সাবা'র ব্যাপারে ত্বাবারীর রাভীদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন? রিজাল্শাস্ত্রের গ্রন্থাবলিতে যেসব শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি কি ত্বাবারীর রাভিগণের ব্যাপারে তা প্রয়োগ করেছেন? তিনি কি যা'ঈফ্ রাভিগণের বর্ণনাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন? তিনি যদি এ প্রশ্নগুলোর হ্যাঁ-বাচক জবাব দেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি মিথ্যা বলছেন। কারণ, তিনি তাঁর গ্রন্থাবলিতে এমন কিছু বিষয় উদ্ধৃত করেছেন যা কোনো নির্ভরযোগ্য দলিলের ওপরই ভিত্তিশীল নয়। তিনি কেবল স্বীয় প্রবৃত্তির পছন্দের ভিত্তিতে সেগুলো গ্রহণ করেছেন, কারণ, ঐ সব ক্ষেত্রে ত্বাবারীর সনদ নির্ভরযোগ্য সনদের শর্তাবলির অধিকারী নয়।

আমরা জানি না, তিনি যেসব সঠিক কথা বলেছেন কেন তিনি নিজে সেসব কথা মেনে চলেন নি! তিনিও কি সেই আমর্ বিল্ মা'রূফ্-কারীদের অন্তর্ভুক্ত যারা নিজেরা মা'রূফ্-কে পরিত্যাগ করেছে? এটাই অধিকতর উত্তম যে, এ ব্যাপারে আমরা মুহিব্বুদ্দীন খাত্বীব্কে তাঁর নিজের বিবেকের ওপর একা ছেড়ে দেব এবং আমাদের আলোচনা অব্যাহত রাখব।

আমরা এ পর্যন্ত বলেছি যে, ইব্নে সাবা'র কল্পকাহিনী ইসলামের ইতিহাসে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এর ফলে এ কল্পকাহিনী রচনার পিছনে যে লক্ষ্য নিহিত ছিল সে লক্ষ্য অর্থাৎ মুসলমানদের আকায়েদের সমালোচনা এবং তাদেরকে অজ্ঞ ও বোকা হিসেবে তুলে ধরা, ভালোভাবেই হাসিল হচ্ছে। কারণ,

---

[১] *মাজাল্লাতুল্ আয্হার্*, ২৪তম সংখ্যা, পৃ. ২১০, ১৩৭৩ হিজরি।

অনেক লেখকই, তাঁদের কথা অনুযায়ী যেসব সাহাবী ইব্‌নে সাবা' দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন, তাঁদেরকে এ লেখকগণ নির্বোধ, নাদান, গুলূকারী ইত্যাদি বলে এবং এ ধরনের আরো অনেক অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। তেমনি আমরা আরো দেখতে পাই যে, এই তথাকথিত ইব্‌নে সাবা' পরিপূর্ণ শক্তি ও দাপট সহকারে এবং হুকূমাতের পক্ষ থেকে কোনোরূপ ভয়-ভীতি ও বাধার মুখোমুখি হওয়া বা জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া ব্যতীতই এমনভাবে স্বীয় আকায়েদের প্রচলন করে যাচ্ছে যে, শেষ পর্যন্ত খুব সহজেই মুসলমানদের সংখ্যাগুরুকেই বিভ্রান্ত করতে ও খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে সক্ষম হচ্ছে, অথচ কেউই তার সাথে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে না বা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে না, অথবা কেউ যদি তার বিরোধিতা করেও থাকে তো সে বিরোধিতা ছিল এমনই নম্র বিরোধিতা যে, তা তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। উদাহরণস্বরূপ, কল্পকাহিনী অনুযায়ী, বসরার ওয়ালী তাকে কেবল শহর থেকে বহিষ্কার করে দেন, কিন্তু শামের ওয়ালী মুআবিয়া বা মিসরের ওয়ালী তা-ও করেন নি!

ড. ত্বাহা হুসাইন্ ইব্‌নে সাবা'র কিচ্ছাকে একটি অসম্ভব ও অবাস্তব বিষয় হিসেবে গণ্য করার পর বলেন :

এ কিচ্ছার মোকাবিলায় সতর্কতার সাথে ও কঠোরভাবে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করা অপরিহার্য এবং খুব সহজেই এটিকে গ্রহণ করা কিছুতেই উচিত হবে না। কারণ, মুসলমানদের শা'ন্-কে এর চেয়ে অনেক বেশি উন্নততর হিসেবে গণ্য করা উচিত যে, একজন ইয়াহূদী ও কৃষ্ণাঙ্গ মায়ের সন্তান–যে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণে নয়, বরং ধোঁকা ও প্রতারণার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে–এসে তাঁদের দ্বীন ও রাজনীতির ওপর, এমনকি তাঁদের আক্‌ল-এর ওপরও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে, আর সে তার এ কাজ করার এতখানি সুযোগ পাবে যে, সে মুসলমানদেরকে তাদের খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করতে এবং তাদের মধ্যে বিভেদের অগ্নি প্রজ্বলিত করতে সক্ষম হবে। সুস্থ বিচারবুদ্ধি সহজে এ বিষয়টি গ্রহণ করে না, সুতরাং এ কিচ্ছাটি কিছুতেই ঐতিহাসিক মতামতের ভিত্তি হওয়া উচিত নয়।[১]

বস্তুত এ কাহিনীটি যে একটি অযৌক্তিক কাহিনী এটি প্রত্যাখ্যানের জন্য এটাই যথেষ্ট এবং হয়তো বা এর সনদ নিয়ে আলোচনা আদৌ অপরিহার্য নয়। কিন্তু ইব্‌নে সাবা'র

---

[১] *আল্-ফিত্‌নাতুল্ কুব্‌রাা*, ড. ত্বাহা হুসাইন্, পৃ. ১৩৪।

বিষয়টি যে ধরনের বিরাট ভূমিকা ও প্রভাব বিস্তার করেছে তার ভিত্তিতে এর যে গুরুত্ব তৈরি হয়েছে সে কারণে এ কিচ্ছার সনদ পর্যালোচনা করা উত্তম, তাহলে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর রাভী কতখানি নির্ভরযোগ্য।

ত্বাবারী কেবল একটিমাত্র সূত্র থেকে ইব্‌নে সাবা'র কিচ্ছা উদ্ধৃত করেছেন, আর এ সূত্রটি হচ্ছে সাইফ্ বিন্ 'উমার্। প্রকৃতপক্ষে ত্বাবারী কেবল এই এক ব্যক্তির বর্ণনার ভিত্তিতে এটি উদ্ধৃত করেছেন এবং অন্য ইতিহাসবেত্তাগণ এটি ত্বাবারী থেকে গ্রহণ করেছেন।

ত্বাবারী হিজরি ৩০ সালের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : "এ বছর আবূ যার্‌কে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে শামে প্রেরণের ঘটনা সংঘটিত হয়– যার পিছনে নিহিত কারণ সম্পর্কে বহু কথা বলা হয়েছে; সেগুলো উদ্ধৃত করা হতে বিরত থাকলাম। মুআবিয়ার সমর্থকরা তাঁর সমর্থনে কথা বলতে গিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন যা আস্-সির্‌রী (السرى) আমাকে এভাবে লিখেছেন : সাইফ্ কর্তৃক শু'আইব্ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (শু'আইব্) 'আত্বীয়াহ্ থেকে ও তিনি ইয়াযীদ্ আল্-ফাক্ব'আসী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, ইব্‌নুস্ সাওদা' শামে প্রবেশ করে, আবূ যারের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁকে বলে : হে আবূ যার্! আপনি কি বিস্মিত হচ্ছেন না যে, মুআবিয়া বলছেন : 'সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সম্পদ।'?"[১]

আহ্‌মাদ্ আমীন্ মনে করেন যে, ইব্‌নুস্ সাওদা' কর্তৃক আবূ যারের মাথায় মায্‌দাকের চিন্তাধারা প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়, আর এর সপক্ষে তিনি উপরিউক্ত দলিল উপস্থাপন করেন এবং বলেন : 'এ কারণেই আবূ যারের চিন্তাধারা ও মায্‌দাকের চিন্তাধারার মধ্যে মিল পাওয়া যায়।' ত্বাবারী বলেন : "আবূ যার্ শামে জনগণের উদ্দেশে বলতেন : 'হে ধনীরা! জেনে রেখো যে, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' আবূ যারের এ আকীদা কোত্থেকে এলো? ত্বাবারী বলেন যে, আবূ যার্ ইব্‌নুস্ সাওদা'র সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[২]

ওপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ত্বাবারীর গ্রন্থে এ কিচ্ছার সনদ হচ্ছে আস্-সির্‌রী, শু'আইব্, সাইফ্ বিন্ 'উমার্, 'আত্বীয়াহ্ ও ইয়াযীদ্ আল্-ফাক্ব'আসী। এবার আমরা

---

[১] *তারীখে ত্বাবারী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৬, ত্বা ১।

[২] *ফাজ্‌রুল্ ইস্‌লাম্*, ড. আহ্‌মাদ্ আমীন্, পৃ. ১১০।

এক এক করে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করব। ত্বাবারীর উদ্ধৃতিতে আরো একটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, ত্বাবারী এ কিচ্ছাটি মুআবিয়ার সমর্থকদের উক্তির ভিত্তিতে উদ্ধৃত করেছেন, আর বলা বাহুল্য যে, মুআবিয়ার সমর্থকরা নিরপেক্ষ ছিল না এবং অন্ধ প্রীতি ও বিদ্বেষের দ্বারা চালিত হয়ে মত প্রকাশ করেছিল।

আমরা শায়খ্ আবূ যুহ্‌রাহ্ ও অন্যদের যেসব বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি সেসবে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ত্বাবারী ইব্‌নে সাবা' সম্পর্কে এবং তার সফর ও পদক্ষেপসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর তথ্যের সনদে কা'রা রয়েছে তা-ও আমরা উল্লেখ করেছি। এবার আমরা এ কাহিনীর সনদের রিজাল্ অর্থাৎ ত্বাবারী, আস্-সির্‌রী, শু'আইব্, সাইফ্ বিন্ 'উমার্, 'আত্বীয়াহ্ ও ইয়াযীদ্ আল্-ফাক্ব'আসী সম্বন্ধে আলোচনা করব। কারণ, এই কয়েক ব্যক্তি ব্যতীত এ কাহিনীর বর্ণনায় অন্য কারো উপস্থিতি নেই, যদিও অনেকে এ কিচ্ছার ভূমিকাকে অনেক বড় করে দেখিয়েছেন এবং একদল অজ্ঞতাবশত ও আরেক দল অসদুদ্দেশ্যে এ কাহিনীর ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অথচ একমাত্র ত্বাবারী ব্যতীত অন্য কোনো ঐতিহাসিক এমনকি আকারে-ইঙ্গিতেও ইব্‌নে সাবা'র কথা বলেন নি। তথাপি পাঠক-পাঠিকাদের মানসিক প্রশান্তির জন্য আমরা এ কিচ্ছার রাভিগণ সম্পর্কে তথ্যাদি উল্লেখ করছি।

সমালোচনা ও পর্যালোচনা

আবূ জা'ফার্ মুহাম্মাদ্ বিন্ জারীর্ ত্বাবারী (ওফাত ৩১০ হিজরি) *তারীখে ত্বাবারী* নামে সমধিক পরিচিত *আত্-তারীখুল্ কাবীর্* গ্রন্থের প্রণেতা। আমরা এখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলেচনা করতে চাই না। কারণ, তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন। তাছাড়া তিনি তাঁর গ্রন্থে যে ইব্‌নে সাবা' সম্পর্কিত কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন সে ব্যাপারে তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় নিজেকে দায়িত্বমুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন : 'এ গ্রন্থে এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো হয়তো অনেকের ভালো লাগবে না বা তাঁদের দৃষ্টিতে তা সহীহ্ বলে গণ্য হবে না। আমি নিজেও এ গ্রন্থে যা কিছু উল্লেখ করেছি তার সবকিছুই সঠিক বলে দাবি করছি

না। কারণ, আমি উদ্ধৃতিসমূহ ঠিক যেভাবে শুনেছি সেভাবে উল্লেখ করেছি; সেসবের পর্যালোচনা এবং সঠিক ও ভুল নির্ধারণের ভার আমি পাঠকদের ওপর অর্পণ করছি।'

বস্তুত ত্বাবারী তাঁর এ বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তুসমূহের সঠিক হওয়া ও না হওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির রাভিগণের ওপরে ভিত্তিশীল করেছেন এবং স্বয়ং সেসবের সত্যাসত্যের ব্যাপারে রায় দেন নি।

আস্-সির্‌রী

ত্বাবারী বলেছেন যে, আস্-সির্‌রী তাঁর জন্য ইব্‌নে সাবা'র কাহিনীটি লিখে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তিনি না তার পুরো নাম উল্লেখ করেছেন, না তার গোত্র ও কোনো স্বজনের নাম উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ আস্-সির্‌রী একজন অজ্ঞাত পরিচয় (مجهول) ব্যক্তি। অবশ্য ত্বাবারী তাঁর গ্রন্থে একবার আস্-সির্‌রী বিন্ ইয়াহ্ইয়াা নামে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন[১] এবং দৃশ্যত মনে হয় যে, এখানেও তিনি একই ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। কারণ, এ নামে কমপক্ষে দু'জন লোকের কথা জানা যায় : একজন আস্-সির্‌রী বিন্ ইয়াহ্ইয়াা বিন্ আইয়াাস্– যিনি ত্বাবারীর সমসাময়িক ছিলেন না, কারণ, তিনি ১৬৭ হিজরিতে অর্থাৎ ত্বাবারীর জন্মের ৫৭ বছর আগে ইন্তেকাল করেন। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, ত্বাবারী এ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হান্নাদ্ বিন্ আস্-সির্‌রী-র (ওফাত ৩২৭ হিজরি) ভ্রাতুষ্পুত্র আস্-সির্‌রী বিন্ ইয়াহ্ইয়াা বিন্ আস্-সির্‌রী। এ ব্যক্তি ত্বাবারীর এবং ইব্‌নে আবী হাতেম্-এরও সমসাময়িক। কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো রেওয়াইয়াত্ই বর্ণিত হয় নি এবং কেউই তার থেকে রেওয়াইয়াত্ করেন নি। এমনকি কোথাও তার নাম মুহাদ্দিস হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি বা কেউ তার কাছ থেকে হাদিস শুনেছেন বলেও উল্লেখ করেন নি। সুতরাং এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ইব্‌নে সাবা'র কাহিনী বর্ণনাকারী আস্-সির্‌রী একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। কেউ কেউ বলেছেন যে, ত্বাবারী আস্-সির্‌রী বলতে শা'বী-র চাচাতো ভাই ও তাঁর কাতেব্ আস্-সির্‌রী বিন্ ইস্‌মা'ঈল্ হামেদানী কূফী-কে বুঝিয়েছেন। কিন্তু এ-ও সঠিক হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ, শা'বী হিজরি ১০৩ সালে ইন্তেকাল করেন এবং ত্বাবারীর জন্ম হিজরি ২২৪ সালে, আর তৎকালীন প্রেক্ষপাটে শা'বীর কাতেব্ হিসেবে দায়িত্ব

---

[১] *তারীখে ত্বাবারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৩।

পালনকারী আস্-সির্‌রী-র এতো দীর্ঘজীবী হওয়ার কথা নয় যার ফলে ত্বাবারীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। এমনকি তথ্যের এ দুর্বলতাটির বিষয় যদি আমরা না-ও ধরি তথাপি ইব্‌নে সাবা'র কাহিনীকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করা চলে না। কারণ, আস্-সির্‌রী বিন্ ইস্‌মা‘ঈল্ হামেদানী কূফী-র এমন সব দোষ বর্ণিত হয়েছে যে কারণে তার বর্ণিত কোনো হাদিস গ্রহণ করা হয় নি। ইব্‌নে মুবারাক্, আবূ দাউদ্ ও নাসাঈ তাকে অনির্ভরযোগ্য হিসেবে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন যে, কেউই তার বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করেন না। ইব্‌নে ‘আদী-ও তার সম্পর্কে একই মত পোষণ করেন। ইব্‌নে হাব্বান্ বলেন : সে রেওয়াইয়াতের সনদে পরিবর্তন সাধন করত এবং কোনোরূপ কারণ ছাড়াই মুর্‌সাল্ রেওয়াইয়াত্ গ্রহণ করত।[1]

অপর কেউ কেউ বলেছেন যে, আস্-সির্‌রী বলতে ত্বাবারী আস্-সির্‌রী বিন্ ‘আছেম্ ইব্‌নে সাহ্‌ল্ আবূ ‘আছেম্ হামেদানী-কে বুঝিয়েছেন– ২৫৮ হিজরিতে যার মৃত্যু হয় এবং তার মৃত্যুর সময় ত্বাবারীর বয়স ছিল ৩০ বছর। কিন্তু ইব্‌নে ফার্‌রাশ্ ও ইব্‌নে ‘আদী এ ব্যক্তিকে অনির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন এবং উভয়ই বলেছেন যে, সে হাদিস থেকে কিছু কথা বাদ দিয়ে বর্ণনা করত। ইব্‌নে নাকূক্বাশ্ বলেন, সে একজন হাদিস জালকারী ছিল এবং যাহাবী তার জাল করা দু'টি হাদিসের কথা উল্লেখ করেছেন।[2]

মোট কথা, আস্-সির্‌রী একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। এরপরও যদি তর্কের খাতিরে আমরা তাকে একজন নির্ভরযোগ্য ও ‘আদেল্ ব্যক্তি হিসেবে ধরে নেই সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে তার শায়খ্ সম্পর্কে–যার কাছ থেকে সে উদ্ধৃতি দিয়েছে–অর্থাৎ শু‘আইব্ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হবে।

শু‘আইব্

শু‘আইব্ বিন্ ইব্‌রাহীম্-ও একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। যাহাবী বলেন : ‘সাইফ্ তার থেকে উদ্ধৃত করেছে। কিন্তু সে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এবং আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানি না যে, সে কে।’ ইব্‌নে ‘আদী-ও একই কথা বলেছেন। সুতরাং

---

[1] *তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব্*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৯-৪৬০; *মীযানুল্ই‘তিদাল্*, যাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০।

[2] *মীযানুল্ই‘তিদাল্*, যাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০; *লিসানুল্ মীযান*, ইব্‌নে হাজার্ ‘আস্ক্বালানী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২।

তার সম্পর্কে আলোচনা দীর্ঘ করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। কারণ, আমরা তার পরিচিতি উদ্ধার করতে পারছি না; আমরা শুধু এতটুকু জানি যে, সাইফ্ বিন্ 'উমার্ তার থেকে উদ্ধৃত করেছে।

সাইফ্ বিন্ 'উমার্

সাইফ্ বিন্ 'উমার্ যাবী আসাদী–বা তামীমী বার্জামী বা সা'দী কূফী– হিজরি ১৭০ সালে মারা যায়। সে ছাক্বীফাহ্র ঘটনা, রিদ্দাহ্র যুদ্ধসমূহ, উসমানের যুগের ঘটনাবলি, আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা'র ক্বিচ্ছা ও তার সহযোগীদের সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং ইসলামি সমাজে তার প্রভাব ও তাদের বিদ্'আত্সমূহের বর্ণনাকারী। সাইফ্ হচ্ছে ইব্নে সাবা'র কিচ্ছার উদ্ভাবনকারী এবং একমাত্র সে-ই ইব্নে সাবা'র কাহিনী সত্য বলে দাবি করেছে।

সাইফ্ বিন্ 'উমার্ মিথ্যাবাদী ও জালকারী বলে অভিহিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সে ছিল একজন যিন্দীক্ব– যে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নামে হাদিস জাল করেছে।[১]

আমরা প্রথমে তাদের দিকে দৃষ্টি দেব সাইফ্ যাদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছে, বরং বলব যে, সে এ কিচ্ছা যাদের কাছ থেকে বর্ণনা করার মিথ্যা দাবি করেছে; এটাই উত্তম যে, আমরা এর পরেই কেবল তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

'আত্বীয়াহ্

আমরা আসলে জানি না 'আত্বীয়াহ্ কে– সাইফ্ বিন্ 'উমার্ যার কাছ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা'র কিচ্ছা উদ্ধৃত করেছে বলে দাবি করেছে। সে কি 'আত্বীয়াহ্ 'আওফী-কে বুঝাতে চেয়েছে যার ওফাত হিজরি ১১০ সালে, নাকি সে 'আত্বীয়াহ্ বিন্ ক্বায়স্ আল্-কাল্লাবী-কে বুঝাতে চেয়েছে যার মৃত্যু ১২১ হিজরিতে? সে 'আত্বীয়াহ্ 'আওফী-কে বুঝাতে চাইবে এটা অসম্ভব, কারণ, তিনি ছিলেন তাবে'ঈ এবং ১১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন; সাইফ্ বিন্ 'উমারের আদৌ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে নি, কারণ, সে তাঁর সমসাময়িক ছিল না। অবশ্য সাইফের জন্য এটা অসম্ভব কিছু নয় যে, সে এমন ব্যক্তির নামে বর্ণনা করবে যাকে সে আদৌ দেখে নি।

---

[১] *তাহ্যীবুল্ কামাল্*, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৩২৪/ ২৬৭৬।

অন্যদিকে 'আত্বীয়াহ্‌ বিন্‌ ক্বায়স্‌ আল্‌-কাল্লাবী ছিল শামের অধিবাসী এবং সাইফের তার সাথে কোনোভাবেই যোগাযোগ ঘটে নি। তাছাড়া সে ছিল একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। সুতরাং আমরা যদি বুঝতেও পারি যে, সে কে ছিল তাতেও কোনোই লাভ নেই। কারণ, সাইফ্‌ নিজেই ছিল একজন মিথ্যাবাদী, সুতরাং 'আত্বীয়াহ্‌ বিন্‌ ক্বায়স্‌ আল্‌-কাল্লাবী থেকে সাইফের বর্ণনার কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই।

ফাক্ব'আসী

সাইফ্‌ বিন্‌ 'উমারের দাবি অনুযায়ী আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে সাবা'র কাহিনীর প্রত্যক্ষ বর্ণনাকারী হচ্ছে ইয়াযীদ্‌ আল্‌-ফাক্ব'আসী। কিন্তু 'ইল্‌মে রিজালের কোনো গ্রন্থেই তার নামের উল্লেখ নেই। সুতরাং অসম্ভব নয় যে, স্বয়ং আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে সাবা'র ন্যায় ইয়াযীদ্‌ আল্‌-ফাক্ব'আসী-ও সাইফ্‌ বিন 'উমারের মস্তিষ্কপ্রসূত একজন কাল্পনিক ব্যক্তি হয়ে থাকবে। কারণ, তার পক্ষে শত শত কল্পকাহিনী ও কাল্পনিক লোক তৈরি করা সম্ভব ছিল।

সাইফ্‌ বিন্‌ 'উমারের বর্ণনাসমূহের পর্যালোচনা

আমরা পুনরায় সাইফ্‌ বিন্‌ 'উমার্‌ সম্পর্কিত আলোচনায় ফিরে আসছি; আমরা এখন দেখব যে, তার বর্ণনাসমূহের মূল্য কতটুকু এবং 'ইল্‌মে রিজালের পণ্ডিতগণ তার সম্পর্কে কী বলেছেন।

ইব্‌নে হাজার 'আস্‌ক্বালানী বলেন : 'সাইফ্‌ বিন্‌ 'উমার্‌ আল্‌-তামীমী আল্‌-বার্‌জামী – বা সা'দী বা আসাদী কূফী– *আর্‌-রিদ্দাহ্‌ ওয়াল্‌-ফুতূহ্‌* গ্রন্থের প্রণেতা এবং সে আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ 'উমার্‌ আল্‌-'উমারী ও আবী যুবাইর্‌ থেকে রেওয়াইয়াত্‌ করেছে। ইব্‌নে মু'ঈন্‌ বলেন : 'সে যা'ঈফুল্‌ হাদিস।' তিনি অন্যত্র বলেন : 'তার থেকে কোনো কল্যাণ পাওয়া যায় না।'

আবূ হাতেম্‌ বলেন : 'তার বর্ণিত হাদিসসমূহ নির্ভরযোগ্য নয় এবং তা ওয়াক্বেদী-র হাদিসসমূহের অনুরূপ।' ইব্‌নে 'আদী বলেন : 'তার বর্ণিত কতক হাদিস মশ্‌হূর, কিন্তু তার বর্ণিত হাদিসসমূহ উপেক্ষা (ইন্‌কার্‌) করা হয়েছে এবং গ্রহণ করা হয় না।'

ইব্‌নে হাব্বান্‌ বলেন : ‘সে হাদিস জাল করত এবং সেগুলোকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে সম্পৃক্ত করে দেখাতো।’ তিনি আরো বলেন : ‘বলা হয়েছে যে, সে হাদিস জালকারী ছিল এবং সে যিন্দীক্ব হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছে।’ বার্‌ক্বানী আদ-দারে কুত্বনী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাইফের হাদিসসমূহ বর্জিত। হাকেম্‌ বলেন : ‘সে যিন্দীক্ব হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছে।’[১]

যাহাবী বলেন : ‘সাইফ্‌ বিন্‌ ‘উমার্‌ আল্‌-যাবী আল্‌-আসাদী আল্‌-তামীমী আল্‌-বার্‌জামী *আর্‌-রিদ্দাহ্‌ ওয়াল্‌-ফুতূহ্‌* গ্রন্থের প্রণেতা।’ এরপর তিনি ইব্‌নে হাজারের ন্যায় তার সম্পর্কে ‘ইল্‌মে রিজাল্‌-এর পণ্ডিতগণের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করেন এবং জা‘ফার্‌ বিন্‌ আবান্‌ থেকে ইব্‌নে নুমাইর্‌-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেন : ‘সাইফ্‌ হাদিস জালকারী ছিল এবং যিন্দীক্ব হওয়ার জন্য অভিযুক্ত ছিল।’[২]

ইব্‌নে আবী হাতেম্‌ বলেন : “ইয়াহ্‌ইয়া বিন্‌ মু‘ঈন্‌ বলেন : ‘সাইফ্‌ বিন্‌ ‘উমার্‌ আল্‌-যাবী–মুহারেবী যার থেকে হাদিস উদ্ধৃত করেছেন–যা‘ঈফ্‌। আমার পিতার নিকট দুই বার সাইফ্‌ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়; তিনি একবার জবাব দেন : ‘সে যা‘ইফ্‌।’ অন্যবার (প্রশ্নের জবাবে) তিনি বলেন : ‘তার বর্ণিত হাদিসসমূহ নির্ভরযোগ্য নয় এবং ওয়াক্বেদী-র হাদিসসমূহের ন্যায়।”[৩]

আল্‌-ক্বা‘ক্বা‘-র পরিচয় দিতে গিয়ে ইব্‌নে আবী হাতেম্‌ তার (আল্‌-ক্বা‘ক্বা‘-র) বর্ণিত একটি হাদিস উদ্ধৃত করেন– সাইফ্‌ যা ‘উমার্‌ বিন্‌ তাম্মাম্‌ থেকে ও সে তা তার (‘উমারের) পিতা থেকে এবং সে তা আল্‌-ক্বা‘ক্বা‘ থেকে রেওয়াইয়াত্‌ করেছে। ইব্‌নে আবী হাতেম্‌ এরপর বলেন : ‘সাইফ নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং তার বর্ণিত হাদিসসমূহ বাতিল; আমরা তার বর্ণিত এ হাদিসটি তার পরিচিতির জন্য লিখেছি।’[৪]

ক্বা‘ক্বা‘ বিন্‌ ‘উমার্‌ থেকে সাইফ্‌ যে হাদিসটি বর্ণনা করে সেটি হচ্ছে এই : ‘রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর ওফাতের সময় আমি মদীনায় ছিলাম। আমি যখন যোহ্‌রের নামায আদায় করলাম তখন এক ব্যক্তি এলো এবং জানালো যে, আনসারা সা‘দ্‌ বিন্‌

---

১. *তাহ্‌যীবুত্‌ তাহ্‌যীব্‌*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯১।

২. *মীযানুল্‌ ই‘তিদাল্‌*, যাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮।

৩. *আজ্‌-জার্‌হ্‌ ওয়াত্‌-তা‘দীল্‌*, ইব্‌নে আবী হাতেম্‌, ২য় খণ্ড, ক্বিস্‌ম্‌ ১, পৃ. ২৭৮।

৪. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬, ক্বিস্‌ম্‌ ২।

'উবাদাহ্‌কে খলীফা নির্বাচিত করতে ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পরিত্যাগ করতে চাচ্ছিল, আর এ কারণে মুহাজিরগণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।"[১]

ইব্‌নুস্ সাকান্ বলেন : সাইফ্ বিন্ 'উমার্ যা'ঈফ্। ইব্‌নে আবী হাতেম্ যে বলেছেন যে, সাইফের বর্ণিত হাদিস নির্ভরযোগ্য নয়, বরং বর্জিত– ইব্‌নে হাজার তাঁর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। ইব্‌নে 'আব্‌দুল্ বার্‌র্-ও ইব্‌নে আবী হাতেম্-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।[২]

সুয়ূত্বী বলেন : 'সাইফ্ হাদিস জালকারী ছিল।' তিনি সাইফ্ কর্তৃক আস্-সির্‌রী বিন্ ইয়াহ্‌ইয়া থেকে ও তার দ্বারা শু'আইব্ বিন্ ইব্‌রাহীম্ থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উদ্ধৃত করেন এবং বলেন : 'এটি একটি জাল হাদিস এবং এটির সনদে যা'ঈফ্ ব্যক্তিরা রয়েছে– যাদের মধ্যে সর্বাধিক যা'ঈফ্ হচ্ছে সাইফ্।'

সাইফ্ বিন্ 'উমার্-এর অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের জন্য 'ইল্‌মে রিজালের মনীষীদের এ ক'টি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট বলে মনে করি। তবে কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, তির্‌মিযী তাঁর *সাহীহ্* গ্রন্থে স্বয়ং সাইফ্ থেকে হাদিস উদ্ধৃত করেছেন এবং এর ভিত্তিতে ধারণা করতে পারেন যে, তির্‌মিযী তার বর্ণিত হাদিসকে সহীহ্ বলে গণ্য করেছেন, সুতরাং সাইফ্ নির্ভরযোগ্য লোক ছিল। এর জবাবে বলতে হয় যে, তির্‌মিযী শুধু এক জায়গায় সাইফ্ বর্ণিত একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন এবং সেই একটি হাদিস উদ্ধৃত করার পর তিনি বলেন যে, এ হাদিসটি উপেক্ষা (ইন্‌কার্) করা হয়েছে। সাইফ্ থেকে তির্‌মিযী যে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন তা হচ্ছে : আবী বাক্‌র্ বিন্ নাফে' কর্তৃক সাইফ্ বিন্ 'উমার্ আস্-সা'দী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে এবং সে (সাইফ্) 'উবাইদুল্লাাহ্ বিন্ 'উমার্ থেকে ও তিনি নাাফে' থেকে এবং তিনি ইব্‌নে 'উমার্ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন : 'তোমরা যখন দেখবে যে, আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ আমাকে গালি দিচ্ছে তখন তোমরা তাকে লা'নত্ করবে।'

---

[১] *আল্-ইছ্বাবাতু ফী তামীযিছ্ ছ্বাহাবাহ্*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯, ত্বা ১।

[২] *আল্-ইস্তী'আব্*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

তির্মিযী এ হাদীছটি উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ "এ হাদীছটি ইন্কার্ করা হয়েছে, সুতরাং এটির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।"[১]

আমাদের মতে, সাইফ্ বিন্ 'উমার্-এর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ, এ থেকে বেশ ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, সাইফ্ ছিল হাদিস জালকারী ও মিথ্যাবাদী এবং তার হাদিস বর্জিত, তেমনি অনেকের মতে সে ছিল যিন্দীক্ব। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তার বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা এখানে 'ইল্মে রিজালের দৃষ্টিকোণ থেকে সাইফ্ বিন্ 'উমার্ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পাঠক-পাঠিকাগণ যাতে বুঝতে পারেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা'র কল্পকাহিনী–ত্বাবারীর পরে অনেক ঐতিহাসিকই যা বর্ণনা করেছেন–মূলে কোনো মশ্হূর্ বর্ণনা ছিল না এবং এটির পিছনে কোনো মযবূত্ ভিত্তি নেই। ত্বাবারীর পরে যে এ কল্পকাহিনী বিখ্যাত হয়ে ওঠে তার কারণ এ নয় যে, এটি মুতাওয়াতির্ সূত্রের বর্ণনা অথবা সাইফ্ বিন্ 'উমার্-এর বর্ণনা সহীহ্। বরং ইব্নে আছীর্, ইব্নে কাছীর্, ইব্নে খাল্দূন্ ও ইব্নুল্ ফিদা' সহ ত্বাবারী-পরবর্তী সকল ঐতিহাসিকই এটি ত্বাবারী থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইব্নে আছীর্ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, ত্বাবারীর গ্রন্থে যা কিছু আছে তিনি তার সবই গ্রহণ করেছেন এবং সেই সাথে কতক বিষয় যোগ করেছেন।[২]

ইব্নে কাছীর্ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে রেওয়াইয়াতের পুরো সনদ উল্লেখ না করে কেবল সাইফ্ বিন্ 'উমার্ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, 'উসমানের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের কারণ ছিল এই যে, এক ব্যক্তি– যাকে আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা' বলা হতো এবং যে ছিল ইয়াহূদী ও বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল– বিভিন্ন শহরে সফর করে বেড়াতো এবং উসমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা ছড়িয়ে দিত, ...।[৩]

ইব্নে কাছীর্ আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা'র কিচ্ছার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। সাইফ্ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার পর তিনি উসমানের যুগের কতক ঘটনা বর্ণনা করেন; তিনি তাঁর গ্রন্থের

---

[১] *সাহীহ্ তির্মিযী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৯৭, হাদিস নং ৩৮৬৬।

[২] *আল্-কামিল্ ফীত্-তারীখ্*, ইব্নে আছীর্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩, প্রথম মুদ্রণ, ১৩০১ হিজরী।

[৩] *তারীখে ইব্নে কাছীর্*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

১৬৯ থেকে ২৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং শেষে বলেন : 'এ হচ্ছে আবূ জা'ফার্ মুহাম্মাদ্ বিন্ জারীর্ ত্বাবারী যা লিখেছেন তার সংক্ষিপ্তসার।'

ইব্নে খাল্দূন্ জঙ্গে জামালে কথিত ইব্নে সাবা'র অনুসারীদের ভূমিকা উল্লেখ করেন এবং এরপর বলেন : 'এই হলো জঙ্গে জামাল্-এর ঘটনার বিবরণ– যা আমি ত্বাবারীর গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছি।'[১]

ইব্নে খাল্দূন্ তাঁর গ্রন্থের ৪৫৭ নং পৃষ্ঠায় বলেন : 'এই হলো ইসলামি খেলাফত এবং তার বিজয়সমূহ ও ঘটনাবলির সমাপ্তি– আমি যা মুহাম্মাদ্ বিন্ জারীর্ ত্বাবারীর *তারীখে কাবীর্* থেকে সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম।'

অনেকেই ইব্নে 'আসাকির্-এর *তারীখে দামিশ্ক্ব*গ্রন্থ এবং ইব্নে বাদ্রাান্ কৃত এরই পরিমার্জিত রূপ *তাহ্যীবে তারিখে দামিশ্ক্ব* গ্রন্থকে ইব্নে সাবা'র কল্পকাহিনীর তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন; কিন্তু *তারীখে দামিশ্ক্ব* গ্রন্থে ইব্নে সাবা' প্রশ্নে হুবহু ত্বাবারীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং ইব্নে বাদ্রাানের *তাহ্যীবে তারিখে দামিশ্ক্ব* গ্রন্থেও তা-ই করা হয়েছে,[২] তবে এ বিষয়ের তথ্যসূত্র কী তা উল্লেখ করা হয় নি। ইব্নে 'আসাকির্ তাঁর গ্রন্থের ৭ম খণ্ডের ৪২ নং পৃষ্ঠায় বলেন : 'সাইফ্ বিন্ 'উমার কর্তৃক আবী হারেছাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি (আবী হারেছাহ্) আবী উসমান থেকে বর্ণনা করেন যে, ...।' এরপর তিনি মিসরে ইব্নে সাবা'র কাহিনী বর্ণনা করেন।

ইব্নে 'আসাাকির্-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইব্নে সাবা'র কিচ্ছা আবীল্ কাসেম্ সামার্ক্বান্দী থেকে, তিনি আবী হুসাইন্ নাক্বূর্ থেকে, তিনি আবী ত্বাহের্ মুখাল্লাছ্ব থেকে, তিনি আবী বাক্র্ সাইফ্ থেকে, তিনি আস্-সির্‌রী বিন্ ইয়াহ্ইয়া থেকে, সে শু'আইব্ বিন্ ইব্রাহীম্ থেকে ও সে সাইফ্ বিন্ 'উমার্ থেকে বর্ণনা করেছে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ইব্নে সাবা'র কিচ্ছার ক্ষেত্রে ইব্নে 'আসাকির্-এর সনদ ত্বাবারীর সনদের সাথে অভিন্ন।

মোট কথা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ কিচ্ছার ক্ষেত্রে মশ্হূর্ ঐতিহাসিকগণের তথ্যসূত্র হচ্ছেন ত্বাবারী, আর ত্বাবারী যা কিছু লিখেছেন তার সবকিছুই সঠিক বলে

---

[১] *তারীখে ইব্নে খাল্দূন্*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৫।

[২] *তাহ্যীবে তারীখে দামিশ্ক্ব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮।

দাবি করেন নি। অন্যদিকে এ কিচ্ছার সনদের রিজাল পর্যালোচনা থেকে আমরা এটির ভিত্তিহীনতার প্রমাণ পাই।

আমাদের মনে হচ্ছে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা'র কল্পকাহিনী যে অবাস্তব– এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এখানে যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে তা-ই যথেষ্ট। অবশ্য এ কল্পকাহিনীর সমালোচনায় আরো অনেক বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু আমরা সেসব উল্লেখ করা হতে বিরত থাকছি। 'আল্লামাহ্ সাইয়্যেদ্ মুর্‌তাযা 'আস্‌কারী তাঁর প্রণীত *আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা'* গ্রন্থে এ কল্পকাহিনী সম্পর্কে অধিকতর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে সাইফ্ বিন্ 'উমার্ বর্ণিত অন্যান্য হাদিসও নিখুঁতভাবে ও বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন। শুধু তা-ই নয়, সাইফ্ বিন্ 'উমার্ যে সব সাহাবীর নামোল্লেখ করেছে তিনি তাঁদের সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। অন্যদিকে 'আল্লামা আমীনী তাঁর প্রণীত *আল্-গ্বাদীর্* গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে সাইফ্ বিন্ 'উমার্-এর রচিত জাল্ হাদিসসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তিনি এ ধরনের ৭০১টি জাল হাদিস চিহ্নিত করেছেন; এ জাল হাদিসগুলোকে তিনি 'তারীখে ত্বাবারী-র প্রতি এক নযর' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

'আল্লামা আমীনী তাঁর *আল্-গ্বাদীর্* গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বলেন : 'ত্বাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে মিথ্যাবাদী ও হাদিস জালকারী সির্‌রী-র সাথে কৃত পত্রালাপ থেকে উদ্ধৃত করেছেন– যে অজ্ঞাত পরিচয় শু'আইব্ থেকে বর্ণনা করেছে, আর সে যিন্দীকৃ হিসেবে অভিযুক্ত হাদিস জালকারী মিথ্যাবাদী (কায্‌যাব্) সাইফ থেকে উদ্ধৃত করেছে– এ উদ্ধৃতির মাধ্যমে ত্বাবারী তাঁর গ্রন্থকে ক্রটিপূর্ণ করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থে এ অনির্ভরযোগ্য সনদ সূত্রে ৭০১টি রেওয়াইয়াত্ উদ্ধৃত করা হয়েছে– যার সবগুলোই হিজরি ১১ থেকে ৩৭ সাল পর্যন্ত সময়কার অর্থাৎ প্রথম তিন খলীফার যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁর পুরো গ্রন্থে এ সনদ সূত্রে কেবল একটি হাদিস রয়েছে যা হিজরি ১০ম সালের সাথে সংশ্লিষ্ট। দৃশ্যত, এ লোকগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তেকালের পরবর্তী সময়কে হাদিস জাল করার সময় হিসেবে বেছে নিয়েছে। ত্বাবারীর ইতিহাস গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি হচ্ছে হিজরি ১১ সালের ঘটনাবলি সম্পর্কিত এবং এ খণ্ডে তিনি ঐ লোকদের কাছ থেকে ৬৭টি হাদিস গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ড হিজরি ১২ সালের ঘটনাবলি সম্পর্কে; এতে তিনি তাদের সূত্রে ৪৩৭টি হাদিস গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি হিজরি ৩৭ সালের ঘটনাবলির বর্ণনায় একই সূত্রে বর্ণিত ২০৭টি হাদিস

গ্রহণ করেছেন। সব মিলিয়ে উক্ত গ্রন্থে এ সনদ সূত্রে বর্ণিত মোট হাদিসের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৭০১টি।'[১]

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা'র কল্পকাহিনী কালের প্রবাহে ইসলামি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে গিয়েছে এবং এর প্রবর্তনের ফলে অন্ধ মাযহাবী বিদ্বেষ দৃঢ়মূল হয়ে বসেছে– যা অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এমনই অন্ধভাবে কাজে লাগানো হয় যে, তার আঘাত কোথায় গিয়ে পড়ে তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামানো হয় না, এমনকি যদিও এ কল্পকাহিনীতে বহু শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে গোমরাহ্, ঈমান-হারা ও জাহেল্ হিসেবে দেখানো হয়েছে। কতক ইতিহাস গ্রন্থে কোনো রকমের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা ব্যতীতই এ কল্পকাহিনী উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারগণ স্বীয় পছন্দ মোতাবেক এ মিথ্যাচারের ওপর আরো রঙ লাগিয়েছেন। অবশ্য আমরা অস্বীকার করছি না যে, এমন অনেকেও আছেন যাঁরা এ কল্পকাহিনীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং যাঁরা এ কল্পকাহিনীকে বিচারবুদ্ধির মানদণ্ডে পর্যালোচনা করেছেন, আর তাঁরা যথার্থই বুঝতে পেরেছেন যে, এ গল্পকে সঠিক বলে গণ্য করা চলে না।

অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

---

[১] *আল্-গ্বাদীর্*, 'আল্লামা আমীনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬।

জীবনী

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন একনিষ্ঠ যুবক সাহাবী

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী যুবক সাহাবী

মূল : মুহাম্মাদ আলী চানারানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত জাফর তাইয়্যার– বাগ্মী যুবক

হযরত আবু তালিবের সন্তান হযরত জাফর ছিলেন মহানবী (সা.)-এর অন্যতম অনুগত সাহাবী ও বিশ্বস্ত সহযোগী। জাফর ইবনে আবি তালিব ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের সম্মানিত ভাই। তিনি হযরত আলীর চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর ঐশী আহ্বানের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দানকারী ও প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন হযরত জাফর তাইয়্যার। মহানবী (সা.) জাফরকে বলতেন : 'হে জাফর! বাহ্যিক অবয়ব ও নৈতিক গুণাবলির দিক থেকে তুমি আমার সদৃশ।'[১]

যখন নবুওয়াতি মিশনের পঞ্চম বর্ষে রজব মাসে মুসলমানদের প্রথম দলটি হাবাশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করে তখন সেই দলের নেতা ছিলেন উসমান ইবনে মাজউন। আর ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী দ্বিতীয় দলটির নেতা ছিলেন পঁচিশ বছরের যুবক জাফর তাইয়্যার। তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস তাঁর সাথে হিজরত করেন। হিজরতকারীদের মধ্যে অনেক সম্মানিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক ছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ ও অনুগ্রহ লাভ করেন জাফর। যখন জাফর হাবাশায় পৌঁছেন তখন তিনি হিজরতকারীদের মুখপাত্র নির্বাচিত হন। তিনি মুখপাত্রের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। আমরা এই বিষয়ে ইতিহাসে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা উল্লেখ করবে।

---

[১] সাফিনাতুল বিহার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪

যখন মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের মক্কা থেকে ইথিওপিয়ার হিজরতের খবর জানতে পারল তখন তারা ইথিওপিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর জন্য বিপুল পরিমাণ উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে মূর্তিপূজারী যুবক আমর ইবনে আসের নেতৃত্বে। আমর ছিল সুবক্তা। তারা ইথিওপিয়ার বাদশা নাজ্জাশীকে মুসলমানদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ করে যাতে তারা তাদের শাস্তি ভোগ করতে পারে।

বাদশাহর সাথে তাঁর দরবারে সাক্ষাতের পূর্বে মক্কার মূর্তিপূজকরা বাদশাহের সভাসদদেরকে বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন প্রদান করে যাতে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং তাদের সমর্থন ক্রয় করতে পারে। সভাসদরা মুশরিকদেরকে যথাসম্ভব (সব ধরনের) সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল এবং বাদশাহের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করল। যখন মক্কার কাফের কুরাইশরা বাদশাহের সাথে সাক্ষাৎ করল তখন তারা হাঁটু গেড়ে বসে ইথিওপিয়ার বাদশাহকে বলল : 'হে বাদশাহ! একদল মূর্খ যুবক মক্কা থেকে আপনার দেশে পালিয়ে এসেছে। তারা তাদের পিতৃপুরুষদের বিশ্বাস ও ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা খ্রিস্টধর্মের সত্যতাকেও স্বীকার করে না; বরং তারা নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করেছে যে সম্পর্কে আপনি অথবা আমরা কখনই কিছু শুনি নি। তাদের বাবা-চাচা ও পরিবারের লোকজন আমাদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছে যাতে আমরা আপনাকে সেসব মুসলমানকে আমাদের হাতে সোপর্দ করার ব্যাপারে সম্মত করাতে পারি। যখন আপনি তাদেরকে আমাদের হাতে সমর্পণ করবেন তখন আমরা তাদেরকে নিজ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। কারণ, তাদের নিকটজনরা তাদের ওপর নজরদারি এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে দায়বদ্ধ। মুসলমানরা নিজেরাও খুব ভালোভাবে জানে যে, তারা তাদের পরিবারকে কী ধরনের অবমাননা ও অসম্মানের মধ্যে নিপতিত করেছে।'

বাদশাহ আমর ইবনে আসের কথা শুনে খুবই রাগান্বিত ও বিরক্ত হলেন। তিনি রাগত স্বরে বললেন, 'আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, তোমার কথা দ্বারা আমার অবস্থানের পরিবর্তন হবে না এবং মুসলমানদের তোমার কাছে হস্তান্তর করব না, বরং আমি মুসলমানদেরকে ডাকব যাতে তারা কেন আমার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং আমার নিরাপত্তাকে অন্য সকল বাদশাহর নিরাপত্তার চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারে। আমি মুসলমানদের কাছ থেকে এই বিষয়ে জানতে চাইব। আমি তাদেরকে তোমার হাতে সমর্পণ করব না, যদি তারা তোমার কথার বিপরীতে

যৌক্তিক কথা বলে। বরং তারা আমার অধিকতর আনুকূল্য ও মনোযোগ পাবে।' এভাবে নাজ্জাশী মুসলমানদের সম্পর্কে কথা বললেন যাতে মুসলমানরা তাঁদের বিশ্বাস ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁকে আরো অধিক অবগত করতে পারে।

মুসলমানরা একটি সভা করলেন এবং কী করা উচিত তা নিয়ে পরস্পর পরামর্শ করলেন। তাঁরা ইসলামের সত্যতা এবং মহানবী (সা.)-এর আইন-কানুন তুলে ধরার বা ব্যাখ্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন, যদি এর ফলাফল তাঁদের অনুকূলে না-ও যায়। এই অভিপ্রায় নিয়ে তাঁর ইথিওপিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে প্রবেশ করলেন। দরবার কক্ষটি খুবই সুসজ্জিত। ইথিওপিয়ার বড় বড় খ্রিস্টান পাদ্রি তাঁদের সামনে বাইবেল খুলে রেখে বাদশার পাশে বসে ছিলেন। মুহাজির মুসলমানরা যখন তাঁদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় বসলেন তখন বাদশাহ তাঁদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন : 'তোমরা যে ধর্ম অনুসরণ কর এবং মেনে চল তা কী– এমন একটি ধর্ম যা তোমাদের নিজ গোত্রসমূহের ধর্মও নয় আবার আমার ধর্মও নয়। এমনকি পৃথিবীর বুকে অন্য কারো ধর্মও নয়?'

হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব যিনি একজন বাগ্মী ছিলেন তিনি মুহাজিরদের প্রতিনিধি হয়ে কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি বললেন : 'হে বাদশাহ! একদা আমরা মূর্খ ছিলাম এবং মূর্তিপূজক জনগোষ্ঠী ছিলাম। আমরা মৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করতাম, কুৎসিত বা নোংরা পাপ এবং লজ্জাজনক কাজ করতাম, আমাদের নিকটজনদের সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নিতাম এবং প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ আচরণ করতাম এবং আমাদের মধ্যকার শক্তিশালীরা দুর্বলদের ও নিম্নশ্রেণির ওপর অত্যাচার করত।

আমরা এভাবেই জবীন যাপন করছিলাম যতদিন না আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে একজন নবীকে উত্থিত করলেন– এমন ব্যক্তি যাঁর পিতামাতা ও বংশধরদেরকে আমরা চিনি, একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি, যাঁর পবিত্রতা নিশ্চিত ও সকলের দ্বারা স্বীকৃত। এই মহান নবী আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি আমাদেরকে পাথরের মূর্তির উপাসনা করা বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন যেগুলোকে আমাদের পূর্বপুরুষরা উপাসনা করত, আর আমাদের নির্দেশ দিলেন সত্য বলার, বিশ্বস্ত হওয়ার, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার, প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় ও ভালো ব্যবহার করার। তিনি আমাদেরকে অবৈধ ও অশ্লীল কাজ, অযৌক্তিক কথা বা

দাবি, কটুকথা বলা, এতীমদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিজ সম্পত্তির সাথে যুক্ত করা, নারীদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা থেকে বিরত রাখলেন।

তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য নির্দেশ দিলেন ও অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে তাঁর সাথে শরীক না করার জন্য নির্দেশ দিলেন, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করতে ও রোযা রাখতে বললেন। আমরাও তাঁর নবুওয়াতি মিশনকে স্বীকার করে নিলাম। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে যা কিছু তাঁর ওপর নাযিল হয়েছে আমরা তা গ্রহণ করলাম। সুতরাং আমরা মুসলমানরা এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং অন্য কাউকে বা কিছুকে তাঁর সমকক্ষ গণ্য করি না। আমরা সেটাকেই হারাম বলে মনে করি যা তিনি হারাম বলে ঘোষণা করেছেন এবং সেটাকেই হালাল বলে মনে করি যা তিনি হালাল ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আমাদের গোত্র আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করেছে এবং তাঁর ঐশী পথনির্দেশনা মেনে চলার কারণে আমাদেরকে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে। যখন আমরা রুক্ষ্ম আচরণ, নির্দয়তা, বাধ্যবাধকতা, বলপ্রয়োগ এবং নির্যাতনের মুখোমুখি হলাম এবং অনুধাবন করলাম যে, তারা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য পালনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন আমরা আপনার দেশে হিজরত করলাম। আমরা বিশ্বের সকল বাদশাহের চেয়ে আপনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি এবং আপনার ন্যায় বিচারের নিকট আশ্রয় নিয়েছি। আমরা আশা করি, আপনার ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষতার ছায়াতলে কেউ কোন ধরনের অবিচার করার কোন অনুমতি পাবে না।

এই বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণের পর জাফর আর কিছু বললেন না। ইথিওপিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন : 'পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের নিকট আগত কোন কিছু তুমি কি জান বা স্মরণ করতে পার যা তাঁদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল?'

জাফর জবাব দিলেন : 'হ্যাঁ।' নাজ্জাশী বললেন : 'তা পাঠ কর।' জাফর জানতেন যে, বাদশাহ ও তাঁর সভাসদরা ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান অনুসারী এবং তাঁদের ধর্মের প্রতি একান্ত অনুগত এবং তাঁরা ঈসা ইবনে মারইয়ামকে বিশ্বাস করেন, তাই তিনি মহিমান্বিত কোরআনের সূরা মারইয়ামের প্রথম কয়েকটি আয়াত খুবই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তেলাওয়াত করলেন। যখন তিনি ঈসা (আ.)-এর জন্মসংক্রান্ত আয়াতগুলো পাঠ করা শুরু করলেন (এবং খ্রিস্টের জন্মের ঘটনা কোরআনের উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী পাঠ করলেন) তখন ইথিওপিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁর কান্নাকে নিয়ন্ত্রণ

করতে পারলেন না, তাঁর গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বাদশাহের সভাসদরা যাঁরা সকলেই বিশপ ছিলেন তাঁরাও এতটা ক্রন্দন করলেন যে, তাঁদের সামনে খুলে রাখা বাইবেলগুলো চোখের পানিতে ভিজে গেল।

তারপর ইথিওপিয়ার ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ বললেন : 'এই শব্দগুলো এবং ঈসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ শব্দগুলো যে একই উৎস থেকে আগত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তোমরা দুশ্চিন্তা কর না এবং তোমরা স্বস্তিহারা হয়ে পড় না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এই দুই লোকের কাছে তোমাদের সোপর্দ করব না।' এরপর তিনি কুরাইশদের দুই প্রতিনিধিকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও কোন অবস্থাতেই আমি এই মুসলমানদেরকে তোমাদের কাছে অর্পণ করব না।' তার তিনি তাঁর সভাসদদের বললেন : 'এই দুইজন আপনাদের মাঝে যা কিছু উপঢৌকন হিসেবে বণ্টন করেছে সেসব তাদেরকে ফিরিয়ে দিন। কারণ, তাদের উপঢৌকনের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আমাকে শাসনক্ষমতা দেয়ার জন্য ঘুষ নেন নি, সুতরাং আমিও আল্লাহর রাস্তায় কোন ঘুষ নেব না।' এইভাবে কুরাইশ প্রতিনিধিরা অপমানের সম্মুখীন হলো এবং পরাজিত হয়ে মক্কায় ফিরে আসল। তারা কুরাইশদের নিকট থেকে যে উপহারগুলো নিয়ে গিয়েছিল সেগুলো ফেরত দিল।[১]

জাফর ইবনে আবি তালিব এবং অন্যান্য মুসলিম হাবাশায় ৭ম হিজরি পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং আফ্রিকায় ১২ বছর বসবাসের পর মদীনায় চলে যান। যখন তাঁরা মদীনায় পৌঁছেন তখন মহানবী (সা.) সদ্য খায়বার যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন। যখন তিনি শুনলেন যে, হযরত জাফর ইথিওপিয়া থেকে চলে এসেছেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে দেখতে যান এবং তাঁকে স্বাগত জানান। যখন তিনি জাফরের সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন মহানবী (সা.) তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁর কপালে চুম্বন দেন। মহানবী (সা.) যখন এরকম করছিলেন তখন আনন্দে তাঁর গাল বেয়ে

---

[১] ইবনে হিশাম, আল সিরাহ আননাবাভীয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৩, তারিখে পায়াম্বারে ইসলাম, পৃ. ১২৯; ইবনে সাদ, তাবাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩; ইবনে আসির, আল কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১; আমতা আল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯; বিহারুল আনওয়ার, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৪২২; আলামুল ওয়ারা, পৃ. ৫৩; তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫

অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তারপর তিনি বললেন : 'আমি জানি না কোন্ কারণে আমি অধিকতর খুশি হব; জাফরের প্রত্যাবর্তনে নাকি খায়বার বিজয়ে!'[১]

হযরত জাফর ইবনে আবি তালিবের জীবনাবসান

মদীনায় প্রত্যাবর্তনের এক বছর পর জাফর ইবনে আবি তালিব জর্ডানে প্রেরিত সেনাদলের অধিনায়ক মনোনীত হন। জাফরকে তিন হাজার সৈন্যের দায়িত্ব দিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানো হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেনাদলকে এগিয়ে দেন এবং তাঁদেরকে বিদায় জানান। বিদায় জানানোর সময় তিনি বললেন : 'যদি জাফর নিহত হয় তাহলে সেনাপতি হবে যায়েদ বিন হারেসা, তারপরে অধিনায়ক হবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। যদি সেও নিহত হয় তাহলে মুসলমানরা যাকে খুশি তাকে তাদের সেনাপতি নির্বাচন করতে পারে।'

মুসলমান সৈন্যরা জর্ডানের 'মুতা' নামক স্থানে রোমান সৈন্যদের মুখোমুখি হন। তিন হাজার মুসলিম সেনার একটি ক্ষুদ্র দল এক লক্ষ রোমান সৈন্যের বিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। জাফর এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করা পর্যন্ত প্রচণ্ড সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ প্রদর্শন করেন। মুসলমান অধিনায়কগণ একের পর এক শাহাদাত বরণ করেন, যতক্ষণ না খালিদ মুসলমানদেরকে কাফির শত্রুদের অবরোধ থেকে মুক্ত করেন এবং তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত জাফরের শাহাদাতের খবর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেয়া হলে তিনি ক্রন্দন করেন এবং বলেন : 'জাফরের মতো ব্যক্তির জন্য আমাদের ক্রন্দন করা উচিত। আল্লাহ তার হাতদুটিকে যা যুদ্ধে কর্তিত হয়েছিল, প্রতিস্থাপন করেছেন দুটি ডানা দিয়ে যাতে সে বেহেশতে ফেরেশতাদের সাথে উড়তে পারে।'

এই কারণেই তাঁকে 'জাফর তাইয়্যার' বলা হয়।[২] যার অর্থ হলো 'জাফর- যে উড়ে বেড়ায়।'

জাফর তেত্রিশ বছর বয়সে শহীদ হন। তাঁকে জর্ডানেই দাফন করা হয় যেখানে তিনি শহীদ হয়েছিলেন।[১]

---

১. আল ইস্তিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১; খিসাল, পৃ. ১০৭

২. তাইয়্যার একটি আরবি শব্দ যার অর্থ ওড়া।

জাফর সেসব ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন যাঁরা এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও লোকজনের মাঝে সুখ্যাতির অধিকারী ছিলেন। ইসলামের আগমনের পর তাঁর স্বাভাবিক গুণাবলি ও অফুরন্ত মানসিক সতর্কতার কারণে তিনি মুসলিম বিশ্বের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হন। ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'আল্লাহ তাঁর নবী (সা.)-এর কাছে জাফরের চারটি গুণের কথা প্রকাশ করেন যা তিনি অর্জন করেছিলেন।' মহানবী (সা.) সেই চারটি গুণ সম্পর্কে জাফরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জাফর জবাবে বলেছিলেন : 'হে রাসূলুল্লাহ! যদি আল্লাহ আমার গুণাবলি প্রকাশ না করতেন তাহলে আমি আপনাকে তা বলতাম না। সেই চারটি গুণ হলো : আমি কখনই মদপান করি নি। কারণ, আমি সবসময় জানতাম যে, মদ আমার বুদ্ধিমত্তাকে হ্রাস করবে; আমি কখনই মিথ্যা বলি নি; কারণ, মিথ্যা মানুষের পৌরুষত্ব ও মানবিকতাকে হ্রাস করে। আমি কখনই ব্যভিচার বা জেনা করি নি এ সত্য জানার কারণে যে, যদি আমি অন্য নারীর সাথে ব্যভিচার বা জেনা করি তাহলে অন্য কেউ আমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার বা জেনা করবে। আমি কখনই মূর্তিপূজা করি নি এই সত্য জানার কারণে যে, মূর্তিপূজার কল্যাণ ও ক্ষতির বিষয়কে বিশ্বাস করা যায় না।'[২]

সেই যুবক যিনি নিশ্চয়তা অর্জন করেন

ইসহাক ইবনে আম্মার বলেন : একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর একদল সাহাবীর সাথে নামায আদায় করলেন। এরপর যখন তিনি সাহাবীদের দিকে ফিরলেন তখন তিনি একজন যুবককে দেখলেন মসজিদের ভেতরে বসে আছে মাথা বুক পর্যন্ত আনত করে যেন সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

নবী (সা.) তাঁকে ডেকে সম্বোধন করে বললেন : 'হে যুবক! তুমি কিভাবে গত রাত অতিবাহিত করেছ এবং কিভাবে সকালে জাগ্রত হয়েছ? যুবকটি উত্তর দিল : 'সারা রাত জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম এবং একে সকালে রূপান্তরিত হতে দেখলাম যখন আমি

---

১. যারকুলি, আল আলাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫; আল ইসাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭; সিফাতুল সাফওয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; মাকাতিল আল তালিবিয়্যীন, পৃ. ৩, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪; ইবনে সাদ, তাবাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২; মুজামুল বুলদান, 'মুতা' শব্দ; আলামুল ওয়ারা, পৃ. ৬৪; ইবনে হিশাম, সিরাতুন নাবাভীয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২; সিরাতুন নবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪; আমতা আল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬

[২] সাদুক, আল আমালী, পৃ. ৭৪

একটি নিশ্চিত অবস্থায় পৌঁছেছি।' মহানবী (সা.) তার উত্তরে অভিভূত হলেন। কারণ, এটি গভীর অর্থবহ ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'প্রতিটি নিশ্চত বিষয়ের একটি নিদর্শন থাকে। তোমার নিশ্চিত বিষয়ের নিদর্শন কী?' যুবকটি জবাব দিল : 'হে রাসূলুল্লাহ! এই নিশ্চিত বিষয়ের কারণে আমি দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছি এবং আমার রাতগুলো নিদ্রাহীন হয়ে গেছে। এই নিশ্চিত বিশ্বাসের কারণে আমি গরমে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যেন আমি রোযা রাখি এবং আমার অন্তর দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মনে হয় যেন আমি আল্লাহর আরশ দেখতে পাই এবং কিয়ামতের দিন সকল মানুষ একত্রিত হয়েছে তাদের পুরস্কার ও শাস্তি গ্রহণের জন্য। আমিও তাদের একজন।

আমি জান্নাতের অধিবাসীদেরকে দেখি হেলান দিয়ে রয়েছে এবং সেখানে অনুগ্রহ উপভোগ করছে এবং সৌজনের সাথে একে অপরের সাথে কথা বলছে, নরম গালিচায় হেলান দিয়ে আছে।

আমি জাহান্নামের অধিবাসীদের দেখি, সেখানে তারা শাস্তি ভোগ করছে। তাদের উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার শুনি এবং আমি জাহান্নামের উচ্চ শব্দ শুনি যা আমার কানে বাজে।'

আল্লাহর নবী (সা.) সাহাবীদের দিকে ফিরে তাঁদেরকে বললেন : 'এই যুবক আল্লাহর অন্যতম বান্দা, আল্লাহ তার অন্তর বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত করেছেন।' তারপর তিনি সেই যুবককে বললেন : 'তুমি এখন যা বিশ্বাস কর তার ওপর বহাল থেক।' যুবকটি বলল : 'আমার জন্য প্রার্থনা করুন যাতে আমি আপনার পাশে থেকে শাহাদাত বরণ করতে পারি।' আল্লাহর নবী (সা.) তাঁর জন্য প্রার্থনা করলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর তিনি একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নয়জন মুসলিম সৈন্যের শাহাদাত বরণের পর দশম ব্যক্তি হিসেবে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

এই হাদীস ব্যাখ্যা করার সময় মরহুম আল্লামা মাজলিশী লেখেন : 'মানুষের অভ্যন্তরীণ আত্মার ওপর অন্ধকার ও অস্পষ্ট পর্দাসমূহ রয়েছে। এই অন্ধকার ও অস্পষ্ট পর্দাসমূহ সত্যের আলো প্রবেশ করতে দেয় না এবং সত্যকে সেখানে প্রজ্বলিত হতে দেয় না। যখন তারা অযথা ও অর্থহীন বাজে কথা বলা, অতিরিক্ত ঘুমানো, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে

আত্মনিয়ন্ত্রণের চর্চা করে তখন এই সকল পর্দা বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং সত্যের আলো সেখানে পরিস্ফুট হয়।[১]

মদীনার যুবকরা এবং আম্‌র ইবনে জুমুহের মূর্তি

ইবনে হিশাম লিখেছেন : 'যারা আল আকাবায় মহানবী (সা.)-এর হাতে বাইআত হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন যুবক। আরবের গোত্রসমূহের অধিকাংশ বয়স্ক লোক অব্যাহতভাবে মূর্তিপূজা চালিয়ে যাচ্ছিল।

বনি সালামার বয়স্ক লোকদের মধ্যে আম্‌র ইবনে জুমুহ নামে এক লোক ছিলেন যিনি অন্য সকলের মতো তাঁর নিজের জন্য একটি মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর আনীত মূর্তির নাম ছিল 'মানাত'। তিনি এই মূর্তিটিকে তাঁর বাড়িতে একটি বিশেষ জায়গায় স্থাপন করেন। যেসব যুবক নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন আম্‌র ইবনে জুমুহ এর ছেলে মাআদ।

মাআদ সবে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং নবী (সা.)-এর কাছে বাইআত হয়েছেন। তিনি অন্যান্য যুবকের সাথে একটি পরিকল্পনা করলেন। তিনি আম্‌র ইবনে জুমুহর মূর্তিটি ঐ স্থান থেকে তুলে নেবেন এবং আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করবেন। তাঁরা এ সাহসিকতার কাজে সফল হলেন এবং মানাতকে একটি আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিতে সক্ষম হলেন। প্রতিদিন সকালে আম্‌র ইবনে জুমুহ তাঁর হারানো মূর্তির খোঁজে বের হতেন। তা খুঁজে পাওয়ার পর তা পরিষ্কার করতেন এবং সেই বিশেষ জায়গায় পুনরায় স্থাপন করতেন। তিনি বলতেন : 'আমি আল্লাহর কসম করছি, যদি আমি তাকে খুঁজে পাই তাহলে কঠিন শাস্তি দেব।' যখন সে দেখল যে, প্রতিদিন এই ঘটনা নিয়মিত ঘটে যাচ্ছে, তখন তিনি একটি তরবারি নিলেন এবং মূর্তিটির ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন : 'আমি জানি না, কে আসে এবং তোমার সাথে এমন অপমানসূচক ও অভদ্র আচরণ করে। তাই আমি তোমার ঘাড়ে তরবারি ঝুলিয়ে দিলাম যাতে এর দ্বারা তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পার– যদি তোমার কোন ক্ষমতা থেকে থাকে।' ঐ রাতেও বনি সালামার যুবকরা তাঁদের প্রতিদিনের কাজের জন্য এলেন। তাঁরা মানাতকে ঘাড়ে তরবারি ঝুলানো অবস্থায় বের করে নিয়ে গেলেন।

---

১. উসুলে কাফী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২; বিহারুল আনওয়ার, ৭০তম খণ্ড, পৃ. ১৫৯, হাদিস ১৭

যখন তাঁরা সেই আবর্জনার স্তূপের কাছে গেলেন তখন মূর্তিটির ঘাড় থেকে তরবারি সরিয়ে সেখানে একটি মাটি দিয়ে তৈরি একটি কুকুরের বাচ্চা ঝুলিয়ে দিলেন। কুকুরটিকে তাঁরা এমনভাবে ঝুলিয়ে দিলেন যেভাবে সেখানে তরবারি ঝুলানো ছিল। অবশেষে তাঁরা পূর্ববর্তী দিনগুলোর মতো মূর্তিটিকে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করলেন।

আম্র ইবনে জুমুহ আবর্জনার স্তূপে নিজের মূর্তিটিকে খুঁজতে গেলেন। সেখানে গিয়ে এমন কিছু দেখতে পেলেন যা দেখে তিনি পিছিয়ে আসলেন এবং গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। বনি সালামার কিছু সংখ্যক যুবক ইতস্তত তাঁর পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা যে, আম্র ইবনে জুমুহ মূর্তিটিকে এমন অসম্মানিত অবস্থায় দেখে কী প্রতিক্রিয়া দেখান এবং এটি তাঁকে মূর্খতার গভীর ঘুম থেকে জাগ্রত এবং সত্যকে স্বীকার করে নিতে উদ্বুদ্ধ করে কিনা। যখন আম্র ইবনে জুমুহ মূর্তিটিকে যে অবস্থায় আবর্জনার স্তূপে ফেলা হয়েছিল সে অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন খুবই নিরাশ হয়ে গেলেন। তিনি মূর্তিটির নিকটে গেলেন এবং তা সরানোর চেষ্টা করলেন। তিনি চিন্তা করলেন যখন মূর্তিটি নিজেকেই সাহায্য করতে পারে না তখন কিভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারবে? বনি সালামার যুবকরা কিছুক্ষণ পর তাঁর নিকটে গেলেন এবং তাঁকে ঐশী সত্য গ্রহণের আহ্বান জানালেন। যুবকদের কথা তাঁর ওপর এত গভীর প্রভাব ফেলল যে, তিনি অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর থেকে তিনি মূর্তিপূজকরদেকে ভর্ৎসনা ও নিন্দা করে কবিতা রচনা করতেন এবং ইসলামের মতো মহান উপহারের জন্য আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মুসলমান ছিলেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন এবং সেই পবিত্র স্থানেই সমাহিত হন।[১]

হানযালা ইবনে উবাই আমির

হানযালা ছিলেন ইস্পাতকঠিন মনোবলের অধিকারী, যিনি তাঁর বিবাহ বাসরকে শাহাদাতের কোলে পরিবর্তন করেন। তিনি মদীনার আনসারদের অন্যতম ছিলেন, যদিও তাঁর পিতা আবু আমির ইসলামের প্রবল শত্রু ছিল এবং জীবনের শেষ দিন

---

১. ইবনে হিশাম, আস সিরাহ আননাবাভীয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫; জিন্দেগানীয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১

পর্যন্ত কাফির অবস্থায় রয়ে যায়। হানযালা মদীনার মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মেয়ে জামিলাকে বিয়ে করেন। হানযালার বিয়ের দিন কাকতালীয়ভাবে ঐ দিনটিতে পড়ে যখন মুসলমানরা উহুদ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। এই কারণে হানযালা মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর পরামর্শ চাইলেন যে, তিনি কি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন নাকি সেই রাতে বিয়ে করবেন। মহানবী (সা.) তাঁকে ঐ রাতে মদীনায় অবস্থান করার উপদেশ দেন এবং বিয়ে করার অনুমতি দেন।

আর তাই হানযালা ওই রাতে মদীনায় থেকে গেলেন এবং বিয়ে করলেন। কিন্তু পরবর্তী দিনে জিহাদের প্রতি ও তাঁর মহান নেতা মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার কারণে তিনি মদীনা ত্যাগ করলেন এবং খুব প্রত্যুষে উহুদের পানে রওয়ানা হলেন। যখন হানযালা উহুদের দিকে রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী জামিলা বিনতে উবাই সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে যাওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন। যখন হানযালা থেকে যেতে অস্বীকার করলেন তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর হাত ধরে তাঁকে চারজন সাক্ষীর সামনে উপস্থিত করলেন এবং হানযালাকে বললেন : 'এই চার ব্যক্তির সামনে আপনি স্বীকারোক্তি দেন যে, গত রাতে আপানি আমাকে বিয়ে করেছেন।' হানযালা স্বীকারোক্তি দিলেন এবং উহুদের দিকে রওয়ানা হলেন। যখন হানযালা যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন তখন সাক্ষীরা তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন : 'কেন তুমি এমনটি করলে?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন : 'গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, আকাশ উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং হানযালা জান্নাতে প্রবেশ করছেন। তাঁর ভেতরে প্রবেশের পর জান্নাতের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি এই স্বপ্ন থেকে বুঝতে পারলাম যে, হানযালা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হতে যাচ্ছেন। তাই আমি এই সত্য বিষয়ের সাক্ষী রাখতে চাইলাম যে, তিনি আমাকে গত রাতে বিয়ে করেছেন, যাতে আমি অপবাদের শিকার না হই বা মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত না হই।'

এই বিবাহের ফল হিসেবে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয় যাঁর নাম ছিল আবদুল্লাহ বিন হানযালা, যিনি ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের পর ৬৩ হিজরির ২৮ যিলহজ মদীনায় গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি ইয়াযীদের বিরুদ্ধে মদীনার জনগণকে সংগঠিত করেন এবং তিনদিন যুদ্ধ ও প্রচণ্ড প্রতিরোধের পর তাঁর সঙ্গী-সাথিসহ শহীদ হন। এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে 'হাররার ঘটনা' নামে প্রসিদ্ধ।

যখন হানযালা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করলেন তখন তিনি এটা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন যে, কীভাবে এবং কোথায় তিনি গোসল করার জন্য পানি পাবেন। হানযালা তাঁর পিতার কারণেও দুঃখিত ছিলেন। হানযালার পিতা ছিল ইসলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রচণ্ড বিদ্বেষী ও শত্রুদের অন্যতম।

হানযালা ইবনে আমির যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি শত্রুপক্ষের একেবারে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং আবু সুফিয়ানকে খুঁজে পান। তিনি আবু সুফিয়ানের ঘোড়াকে অনুসরণ করেন। হানযালা ইবনে আমির তাকে হত্যার করতে উদ্যত হয়েছিলেন এমন সময় আবু সুফিয়ান মুশরিকদেরকে তার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য ডাক দেয় যাতে তারা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। মুশরিকরা তার ডাকে সাড়া দেয় এবং তাদের নেতাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। শাদ্দাদ ইবনে আওস নামের এক কাফের হানযালার গতিরোধ করে এবং তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। আবু সুফিয়ান হানযালার পেছন থেকে বর্শা নিক্ষেপ করার সুযোগ পেয়ে যায়। বর্শাটি হানযালার পিঠে বিদ্ধ হয়। হানযালা আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার জন্য পেছনে ফেরেন, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে যায়। হানযালা মাটিতে পড়ে গেলেন এবং অন্যান্য মহান শহীদ, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা হযরত হামযা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাযম্ এবং অন্যদের সাথে মিলিত হলেন।

যখন উহুদের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল তখন মহানবী (সা.) হানযালা সম্পর্কে একটি চমৎকার উক্তি করেন। তিনি বলেন : 'আমি দেখতে পাচ্ছি ফেরেশতারা পরিষ্কার ও পবিত্র পানি দিয়ে তাকে ধৌত করছে এবং তার গোসল দিচ্ছে।'

এই উক্তির পর থেকে ... যুবক হানযালা 'হানযালা, গাসীলুল মালাইকাহ' (হানযালা– ফেরেশতাদের কর্তৃক গোসলকৃত) উপাধিতে ভূষিত হন।[১]

আবু আমির বাহিরের সন্তান এই যুবক তাঁর স্ত্রীর নিকট অবস্থান করার চেয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি দুনিয়ার ক্ষণিকের আনন্দ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন, এমনকি তিনি গোসল করার মতো পর্যাপ্ত পানিও খুঁজে পান

---

[১] বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৫৫; আল ইসাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭; ইবনে হিশাম, সিরাহ আননাবাভীয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১; তারিখে পায়াম্বারে ইসলাম, পৃ. ৩২৮

নি। এটি তাঁর জন্য একটি মহা গর্বের বিষয় যে, ফেরেশতারা জান্নাতের পরিষ্কার ও পবিত্র পানি দ্বারা তাঁর গোসল দিয়েছিলেন।

সাওবান, যিনি মহানবী (সা.)-কে ভীষণ ভালোবাসতেন

সাওবান ছিলেন ইয়াযদুদ এর ছেলে। তিনি ছিলেন 'সারাত' পরিবারের সন্তান, যে গোত্র বসতি গড়েছিল মক্কা ও ইয়েমেনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু আবদুল্লাহ। মহানবী (সা.) তাঁকে ক্রয় করেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর খাতিরে এবং তাঁর সন্তানদের জন্য তাঁকে মুক্ত করে দেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকট অবস্থান করাকে অগ্রাধিকার দেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সেবা করেন। তিনি সবসময় মহানবী (সা.)-এর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। একদিন তিনি মহানবী (সা.)-কে দেখতে আসেন। তখন তাঁর পুরো চালচলন পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি একেবারে শুকিয়ে যান, ফ্যাকাশে ও বেদনার্থ হয়ে পড়েন। মহানবী (সা.) তাঁর এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কেমন অনুভব করছেন। সাওবান জবাব দিলেন : 'আমার কোনো কষ্ট নেই, যা-ই হোক না কেন, কিন্তু আমি কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে ভীত যে, যখন আমি আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। আমি ভয় পাচ্ছি যে, ভাগ্যনির্ধারণী দিনে আপনাকে দেখতে পাব না। যদি আমি সেসব লোকের একজন হই যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাহলেও বেহেশতে আপনার স্তর ও অবস্থান আমার অবস্থানের চেয়ে অনেক উচ্চ হবে, যেমন করে কতিপয় নবীর মর্যাদা অন্যান্য নবীর চেয়ে উচ্চে।'

এই সময়ে ওহীর দূত জিবরাইল (আ.) অবতরণ করলেন এবং এই আয়াত নাযিল করলেন :

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ
وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَـٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

'এবং যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সুতরাং তারা সেই লোকদের সাথি হবে নবিগণ, সত্যবাদিগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণদের মধ্য থেকে আল্লাহ যাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন। আর তারা কত উত্তম সাথি!'– সূরা নিসা : ৬৯

তারপর মহানবী (সা.) সাওবানকে বললেন : 'আমি আল্লাহর শপথ করছি, যাঁর হাতে আমার জীবন নিবদ্ধ, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তিই নিরাপদ নয় যদি না সে তার নিজের, তার পিতা, তার মাতা, তার স্ত্রী, তার সন্তান এবং অন্য সকলের চেয়ে আমাকে বেশি ভালো না বাসে।'

আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) সবসময় বলতেন : 'আমি মহানবী (সা.)-কে আমার সম্পদ, আমার সন্তান-সন্ততি, আমার পিতা, আমার মাতার চেয়ে অধিক ভালোবাসি। উত্তপ্ত মরুভূমিতে একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানিকে যেমন ভালোবাসে আমি তাঁকে তার চেয়েও অধিক ভালোবাসি।' [১]

যে কারণে আমাদের উচিত মহানবী (সা.)-কে অন্য সকলের চেয়ে বা সকল কিছুর চেয়ে অধিক ভালোবাসা তা হলো তিনি আমাদেরকে অজ্ঞতা থেকে এবং অনর্থক মূর্তিপূজা থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং সকল দিক থেকে তিনি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই

বনি মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬ষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে। ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য মহানবী (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে ছিল মদীনার মুশরিকদের অন্যতম সর্দার সেও তার অনুগতদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেয়। কারণ, তারা গনীমতের জন্য লালায়িত ছিল এবং যুদ্ধকে বিফলে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। একজন মুহাজির যাহযাহ ও একজন আনসার নিসান ইবনে ওয়ারার মধ্যে মতপার্থক্যের কারণে একটি অন্তর্কোন্দল তৈরি হতে যাচ্ছিল মদীনায়। নিকটবর্তী একটি কূপ থেকে পানি তোলার ব্যাপারে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই খুবই রাগান্বিত হয় এবং আনসারদের উদ্দেশে বলে : 'এই লোকদের (মক্কা থেকে আগত) কি সত্যসত্যই আমাদের সাথে লড়াই করার সাহস আছে? তারা আমাদেরকে আমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে এনেছে এবং আমাদের ভূমিতে আড়ম্বরপূর্ণ আচরণ করছে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি

---

[১] আল ইস্তিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০; আল ইসাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২; মাজমাউল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮; যারকুলি, আল আলাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২; তারিখে পায়াম্বারে ইসলাম, পৃ. ২০১

যখন আমি মদীনায় ফিরে যাব তখন যারা ভালোবাসার পাত্র ও সম্মানিত (অর্থাৎ মদীনার ইহুদি ও মুনাফিকরা) তারা যারা হীন ও ঘৃণ্য (সে মহানবী সা. ও মুসলমানদেরকে বোঝায়) তাদেরকে বের করে দেব।'

যায়েদ ইবনে আরকাম উঠে দাঁড়ালেন এবং মহানবী (সা.)-কে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করার জন্য গেলেন। মহানবী (সা.)-এর কতিপয় সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু আল্লাহর নবী (সা.) এই প্রস্তাবকে নাকচ করে দিলেন। এর পরিবর্তে মহানবী (সা.) এই অবস্থাকে শামাল দেয়ার জন্য একজন সেনাকে বিবাদের স্থানে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ কথা শুনল তখন সে তার বড় বড় কথা ভুলে গেল এবং দ্রুত ক্ষমা চাওয়ার জন্য মহানবী (সা.)–এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রওয়ানা হলো। এই ঘটনার পর সূরা মুনাফিকুন নাযিল হয়। এই সূরার উদ্দেশ্য হলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের আবদুল্লাহ নামে একজন ছেলে ছিল, যাঁর পূর্ব নাম ছিল হাব্বাব। যখন তিনি তাঁর পিতার কথা ও পরিকল্পনার কথা শুনলেন তখন মহানবী (সা.)-এর নিকটে গেলেন এবং বললেন : 'আমি শুনেছি যে, আপনি আমার পিতাকে তার কপটতার জন্য হত্যা করতে চাচ্ছেন। যদি তা সত্য হয় তাহলে তাকে হত্যা করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করুন। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি তার মাথা আপনার জন্য নিয়ে আসব। আমি আল্লাহর শপথ করছি যে, বনি খাযরাজের সবাই জানে যে, আমি যেমন আমার পিতাকে ভালোবাসি অন্য কেউ তার পিতাকে এত ভালোবাসে না। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যে, আপনি হয়তো অন্য কারো ওপর তাকে হত্যার দায়িত্ব অর্পণ করবেন। যদি আপনি তা-ই করেন তাহলে আমি হয়তো আমার পিতার হত্যাকারীকে জীবিত দেখা সহ্য করতে পারব না। প্রতিশোধস্পৃহা হয়তো আমাকে আমার পিতার হত্যাকারীর ওপর প্রতিশোধ নিতে বাধ্য করবে এবং এর ফলে আমি একজন মুসলমানকে হত্যার কারণে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হব। মহানবী (সা.) বলেন : 'না, তুমি তোমার পিতাকে হত্যার মনোবাসনা করো না। আমরা সবসময় তোমার পিতার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌহার্দ্রপূর্ণ আচরণ করব।"

এই ঘটনার কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাহ তার নিজ গোত্রের ধিক্কার ও নিন্দার পাত্র হয়। আবদুল্লাহ ৯ম হিজরিতে মারা যান।[১]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ– অগ্রদূত মহিমান্বিত কোরআনের প্রচারক

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন মক্কার হুযাইল গোত্রের এবং ইসলাম গ্রহণকারী ৬ষ্ঠ মুসলমান। তিনি তাঁর জীবনে দুই বার হিজরত করেন, প্রথমে মক্কা থেকে ইথিওপিয়ায় এবং নবুওয়াতি কার্যক্রমের তেরতম বছরে মক্কা থেকে মদীনায়।

তিনি মহানবী (সা.) ও অন্যান্য মুসলমানের সাথে সকল গাযওয়া ও সারিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

ইবনে মাসউদ ছিলেন সে সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা মৃত্যুর পর বেহেশতের লাভের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় পুরো কোরআন শরীফ মুখস্থ করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর মানুষজন সহিহ ও সঠিকভাবে মহিমান্বিত কোরআন তেলাওয়াতের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হওয়ার জন্য বলতেন। তাঁর পেশা ছিল কোরআনের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া, মহানবী (সা.)-এর জীবনপদ্ধতি ও বাণী (হাদিস) প্রচার করা, অজ্ঞদের শিক্ষা দান, যারা জানত না তাদেরকে অবহিত করা, মানুষের অন্তরকে দৃঢ় ও স্থির করা এবং বিশ্বাস ও ধর্মের ভিত্তিতে শক্তিশালী করা।

যুবক বয়সেই তিনি মহানবী (সা.)-এর ঐশী আহ্বানের কথা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি কোরআন নাযিলের কথা জানতে পারেন। জানার জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছা নিয়ে তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে যান এবং বলেন : 'হে রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি যেসব ওহী নাযিল হয়েছে তার থেকে কয়েকটি আমাকে শিক্ষা দিন।' যখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি কেবল সাবালক হয়েছেন এবং সেজন্য ধর্মীয় ফরয পালন করা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক হয়েছিল। ইবনে মাসউদ স্মরণ করতেন : 'সে সময়ের পর থেকে আমি

---

[১] বিহার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২৮৮; তাফসীরে কুম্মী, পৃ. ৬৮০; ইবনে হিশাম, সিরাত আননাবাভীয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৩; তারিখে পায়াম্বারে ইসলাম, পৃ. ৪৩৭; আত তাম্বিহ ওয়াল আশরাফ, পৃ. ২১৫; ইবনে সাদ, তাবাকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩; যারকুলি, আল আলাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৫; তারিখে খামীস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০; আমতা আল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯; আল মুহাব্বার, পৃ. ২৩৩; জামহারাহ আল আনসাব আল আরাব, পৃ. ২৩৫

মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি সত্তরটি সূরা মুখস্থ করেছি ও শিক্ষা লাভ করেছি। আমি উত্তমভাবে এই সত্তরটি সূরা শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, এমনকি অকল্যাণকামী ও ছিদ্রান্বেষণকারীরা পর্যন্ত আমার কোরআন তেলাওয়াতের সমালোচনা করতে পারবে না।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন প্রথম মুসলিম যিনি মক্কার মুশরিকদের সামনে নির্ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পাঠ করতেন। একদিন একদল নব মুসলিম এক জায়গায় সমবেত হলেন এবং বললেন : 'এখন পর্যন্ত মক্কার মুশরিকরার আমাদের কাউকে কোরআন পাঠ করা শোনে নি। আমাদের মধ্যকার কে স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালন করতে পারবে?' ঐশী বাণীর প্রেমিক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ উচ্ছাসভরে বললেন : 'আমি স্বেচ্ছায় রাজি আছি।' অন্য যেসব যুবক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বললেন : 'না, তুমি না। যে এই বিপজ্জনক দায়িত্ব পালন করবে তার মক্কায় আত্মীয়-স্বজন থাকতে হবে যাতে যদি মুশরিকরা তার ক্ষতি করতে চায় তাহলে তার আত্মীয়-স্বজনরা কাফেরদের ক্রোধ থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ! মক্কায় তোমার কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। সুতরাং এই দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করা বিপজ্জনক।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন : 'আমাকে এই দায়িত্ব পালন করতে দাও এবং আমার জন্য চিন্তিত হয়ো না। কারণ, আল্লাহ আমার সহায় এবং রক্ষাকারী।'

পরদিন খুব সকালে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ কাজের জন্য বের হলেন এবং ইবরাহীম (আ.) কাবা শরীফ মেরামতের পর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং নামায আদায় করেছিলেন সেখানে দাঁড়ালেন। যখন কুরাইশের বয়স্করা সূর্যোদয়ের পর কাবায় একত্রে মিলিত হলো তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পাঠ করতে লাগলেন।

তিনি সূরা আর রাহমানের কয়েকটি আয়াত মুখস্থ করেছিলেন, যা তিনি সাহসিকতার সাথে মুশরিকদের সামনে প্রথমবারের মতো পাঠ করেন এবং তাদেরকে নিজেদের কানে আল্লাহর বাণী শুনতে বাধ্য করেন। মুশরিকরা তাঁর দিকে লক্ষ্য করল এবং তিনি কে এবং তিনি যা পড়ছিলেন তা জানতে কৌতূহলী হলো। তাদের কেউ কেউ বলল : 'মুহাম্মাদ যা এনেছে সে তা পাঠ করছে।'

যখন মুশরিকরা বুঝতে পারল যে, ইবনে মাসউদ মক্কার কোন ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত নন, কিন্তু তাদের মধ্যে কোরআন পাঠ করার সাহস ও ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন তখন তারা তাকে ঘিরে ধরে ভীতি প্রদর্শন করল। কিন্তু তারা তাঁকে বিরত রাখতে পারল না। তিনি নির্বিকারভাবে কোরআন পাঠ করে যেতে থাকলেন।

মূর্তিপূজকরা তাঁর নির্লিপ্ততায় অপমানিত বোধ করল এবং তাঁকে প্রহার করা শুরু করল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বিস্ময়করভাবে তাদেরকে প্রতিহত করতে লাগলেন। কিছু সময় পর তিনি নিজেকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হলেন এবং তাঁর দলের কাছে ফিরে আসেন। যখন তাঁরা তাঁকে দেখেন যে, তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন– মাথায় ও সারা মুখে রক্ত তখন তাঁরা বলেন : ‘এটাই আমরা ভয় পাচ্ছিলাম।’ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : ‘এতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি আবার যাব এবং আগামীকাল সকালে তাদের মধ্যে গিয়ে মহিমান্বিত কোরআন পাঠ করব।’ মুসলমান যুবকরা বললেন : ‘এর আর প্রয়োজন নেই। যেটি প্রয়োজন ছিল যে, তাদের কানে ঐশী বাণী পৌঁছানো, যদিও তা একবারের জন্যও হয়।’

ইবনে মাসউদ পবিত্র কোরআনের একজন বড় হাফেয, কারী ও তাফসীরকারক ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের তাঁর মতো যোগ্যতাসম্পন্ন পণ্ডিত খুব কমই দেখা যায়।

তিনি সেই যুবকদের অন্যতম যাঁদের উপলক্ষে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় :

ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡقَرۡحُۚ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ
مِنۡهُمۡ وَٱتَّقَوۡاْ أَجۡرٌ عَظِيمٌ ١٧٢

‘(ওহুদ যুদ্ধে) যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল তাদের মধ্যে যারা পুণ্যকর্মশীল ও সাবধানী তাদের জন্য রয়েছে মহত্তম প্রতিদান।’- সূরা আলে ইমরান : ১৭২

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟
ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

‘উত্তম পন্থা ভিন্ন ইয়াতিমের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে পৌঁছে এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে পরিমাপ ও ওজন করবে। আমরা কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের অধিক ভার অর্পণ করি না এবং যখন কথা বলবে তখন ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করবে, যদিও সে তোমার নিকটাত্মীয় হয়, আর আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের এ সমস্ত নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।’-সূরা আন আনআম ৫২

আমরা ইবনে মাসউদের উদ্ধৃতি দিয়েই তাঁর আলোচনা শেষ করব– ‘উত্তম কর্মের ভিত্তি ও প্রমাণ পথের শেষে দৃশ্যমান হয় এবং সবচেয়ে মহান পরিসমাপ্তি হলো আল্লাহর পথে উৎসর্গ হওয়া।’[1]

আবদুল্লাহ ইবনে মুযনি– আলোকিত হৃদয়ের যুবক

আবদুল্লাহ ছিলেন মুযাইনাহ গোত্রের অধিবাসী এবং তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। তিনি শিশুকালেই এতীম হন এবং তাঁর চাচার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। কঠোর প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে তিনি বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেন; যার মধ্যে ছিল উট, ভেড়ার পাল এবং দাসদাসী। চাচার আনুগত্যের কারণে প্রাথমিকভাবে আবদুল্লাহ মুযনি পৌত্তলিক ছিলেন। কিন্তু প্রতিমাসমূহ প্রাণহীন মূর্তি ছাড়া কিছু নয়, এটি বুঝতে পেরে তিনি মূর্তিপূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হন। কিন্তু তাঁর চাচার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণে তিনি প্রকাশ্যে জনসমক্ষে এটি ঘোষণা করতে পারছিলেন না। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, একদিন তাঁর চাচাও ইসলাম গ্রহণ করবেন এবং তাঁর জন্য ইসলাম গ্রহণের পথ তৈরি করবেন।

---

[1] আল-গাদীর, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ১১; আল ইসাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯২; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯; ইবনে আবিল হাদীদ, শারহে নাহজুল বালাগা, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২৫; কামুস আল রিযাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৬; হায়াতুস সাহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬; ইবনে হিশাম, সীরাতে নাবাভীয়্যাহ, ২য় খণ্ড; ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭; ইবনে আসির, কামিল ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৯।

মক্কা বিজয়ের পর আবদুল্লাহ মুযনি আশা করলেন যে অন্য সকল মুশরিকের ন্যায় তাঁর চাচাও ইসলাম গ্রহণ করবে, কিন্তু তাঁর চাচা ইসলাম গ্রহণ করল না; বরং সে মূর্তিপূজকই থেকে গেল। আবদুল্লাহ- যাঁর নাম প্রথমে মূর্তিপূজকদের রীতি অনুযায়ী আবদুল উযযা ছিল তিনি অবিশ্বাসী ও কাফির অবস্থায় থাকতে পারছিলেন না এবং অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। তিনি সাহস সঞ্চয় করে তাঁর চাচাকে বললেন : 'হে চাচা! আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম যে, আপনি মুসলমান হবেন এবং আমিও তাহলে সহজে মুসলমান হতে পারব। যেহেতু আপনি মূর্তিপূজা করে যাচ্ছেন, তাই আমি আর এই মূর্খতা ও কাফির অবস্থায় থাকতে পারছি না। সুতরাং আমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার অনুমতি দিন।' একথা শুনে তাঁর চাচা ক্রোধে ফেটে পড়ল এবং বলল : 'আমি কখনই তোমাকে এমন অনুমতি দেব না।' আবদুল উয্‌যা বললেন : 'আমি যে কোন মূল্যে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তাঁর চাচা তাঁকে রাগান্বিত হয়ে সতর্ক করলেন : 'যদি তুমি মুসলমান হও, তাহলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব।' আমি তোমার সব উট, ভেড়ার পাল, দাস-দাসী ও পোশাক-আশাক কেড়ে নেব।'

আবদুল উয্‌যা বললেন : 'আমি স্বেচ্ছায় আমার যা কিছু রয়েছে সবই আপনাকে দিয়ে দেব।' একথা বলার পর তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পোশাক খুলে ফেললেন এবং তাঁর চাচার সামনে ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর এই সকল শব্দ যা তাঁর অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি, আনন্দ ও সত্যের ইবাদতের উচ্ছাসকে প্রকাশ করে, আবদুল উয্‌যা বললেন : 'এই সকল জিনিস আপনার। সম্পত্তি ও পার্থিব সম্পদ আপনার কাছে অনেক কিছু, কিন্তু এগুলো আমার কাছে মূল্যহীন। আমার মতে, এগুলো প্রকৃত সফলতা ও পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সাথে তুলনীয় নয়।' এই কথা বলে আবদুল উয্‌যা শূন্য হাতে ও খালি গায়ে তাঁর মায়ের কাছে গেলেন এবং বললেন : 'আমি মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি কেবল আমার দেহ ঢাকার মতো একটুকরো কাপড় চাই।'

তাঁর মা একটি লিনেন কাপড় নিয়ে আসলেন যা একটি পোশাক হিসেবে যথেষ্ট। আবদুল উয্‌যা এই কাপড় দুই টুকরো করলেন এবং তা দিয়ে তাঁর শরীর আবৃত করলেন। আধ্যাত্মিক আনন্দে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁর ঘোড়া ছিল নালহীন এবং পথে মরুভূমির ঘাস ও বিক্ষিপ্ত স্থানে জমে থাকা পানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিন্তু ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসার কারণে এই সকল প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আদ্যে চিন্তিত ছিলেন না। ইসলামের প্রতি প্রগাঢ়

ভালোবাসাতাড়িত হয়ে তিনি দ্রুত ও শীঘ্র সকল পাহাড় ও মরুভূমি অতিক্রম করে মদীনায় পৌঁছেন।

মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা ফজরের নামায সবেমাত্র শেষ করেছেন সেসময় এই যুবক, যিনি সত্যকে অন্বেষণ করছিলেন, মসজিদে প্রবেশ করেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সামনে গেলেন এবং শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে সম্ভাষণ জানালেন। তাঁর অপরিচিত চেহারা, বিধ্বস্ত অবস্থা এবং বেমানান পোশাক মসজিদের সকল দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহানবী (সা.) স্নেহভরে জিজ্ঞেস করলেন : 'তুমি কে?' যুবকটি জবাব দিলেন : 'আমার নাম আবদুল উয্যা। ইসলাম গ্রহণের অভিপ্রায় নিয়ে আমি মক্কা থেকে এসেছি। আমার অভিপ্রায়ের কারণে আমার চাচা আমার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে, এমনকি আমার পোশাকও।' আবদুল উয্যা কালেমা শাহাদাত পাঠ করেন এবং মুসলমান হয়ে যান। মহানবী (সা.) স্মিত হাসেন এবং বলেন : 'আজ থেকে তোমার নাম হবে আবদুল্লাহ।' যেহেতু তিনি আল্লাহর পথে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন, সেহেতু তিনি 'আবদুল্লাহ যুল বাজাদাইন' (অর্থাৎ দুই টুকরা কাপড়ের অধিকারী আবদুল্লাহ) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহানবী (সা.) তাঁকে নির্দেশ দেন : ' তোমার বাড়ি আমার বাড়ির পাশে নির্মাণ কর এবং আমার অন্যতম প্রতিবেশী হয়ে যাও।' আবদুল্লাহ দ্রুত ইসলামের বিধিবিধান রপ্ত করে নেন, ধর্মের প্রতি দারুন অনুরক্তির কারণে। তিনি সমবসময় মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তেলাওয়াত ও নামায আদায় করতেন। উমর আবদুল্লাহকে একাজ হতে বিরত রাখতে চাইতেন। মহানবী (সা.), যিনি জানতেন যে, আবদুল্লাহ আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে একাজ করছেন তিনি উমরকে তা হতে নিষেধ করেন : 'তাকে উচ্চৈঃস্বরে মহিমান্বিত কোরআন তেলাওয়াত ও নামায পড়া থেকে নিষেধ কর না। কারণ, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কারণে হিজরত করেছে।'

শেষ কামনা

এই যুবক, যিনি তাঁর সর্বস্ব পরিত্যাগ করেছিলেন, তিনি সত্যিকারভাবে কী চাইতেন? এর উত্তর হলো, তিনি কেবল চাইতেন একটি মাত্র জিনিস– বস্তুগত অনেক জিনিসের চেয়ে এবং সেটা ছিল শাহাদাত, সুমহান আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করা।

উহুদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরিতে সংঘটিত হয় এবং মুসলিম বাহিনী মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন : 'হে

রাসূলুল্লাহ! আপনার কাছে অনুরোধ করছি আল্লাহর কাছে সত্যের পথে নিহত হয়ে আমার জন্য শাহাদাতের সম্মান প্রদানের প্রার্থনা করতে।'

মহানবী (সা.) বললেন : 'একটি বাকল নিয়ে আস।' আবদুল্লাহ দ্রুত একটি গাছের বাকল খুঁজতে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহর কাছে নিয়ে আসলেন। মহানবী (সা.) সেই বাকলের ওপর কিছু লিখলেন : 'আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে মুসলমানদের রক্ত ঝরানোকে নিষেধ করেছেন।'

আবদুল্লাহ মনে করলেন তাঁর মনোবাসনা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং তিনি দুঃখিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : ' হে রাসূলুল্লাহ! আপনি যা লিখেছেন আমি এর চেয়ে ভিন্ন কিছুর অনুরোধ করেছিলাম।' মহানবী (সা.) বললেন : 'তুমি একজন শহীদ বলে গণ্য হবে, এমনকি যদি তুমি মাথা ব্যথার কারণেও মারা যাও। কারণ, তুমি আল্লাহর পথে হিজরত করেছ।

যখন মুসলিম বাহিনী তাবুক অঞ্চলে পৌঁছে তখন আবদুল্লাহ প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে তাবুকে দাফন করা হয়।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইসলামের পথে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেন। তিনি এটা করেন আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও ভালোবাসপূর্ণ অন্তর নিয়ে। তিনি চিরকালীন কল্যাণ ও গৌরব অর্জনের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু ছিল তা প্রত্যাখ্যান করেন।

আম্মারাহ ইবনে যিয়াদ– আত্মত্যাগ ও সেবার মানসিকতায় পূর্ণ যুবক

আম্মারাহ ইবনে যিয়াদ ছিলেন আওস গোত্রের লোক এবং মদীনার আনসারদের অন্যতম। যখন মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন সেদিন মুসআব ইবনে উমাইর ও আবু দুজানা তাঁদের সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা তাঁদে রক্ষা করন। মদীনার আনসারদের মধ্য থেকে পাঁচজন যুবক দ্রুত গতিতে মহানবীকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন আম্মারাহ ইবনে যিয়াদ। আম্মারাহ ইবনে যিয়াদ চরম বীরত্বের সাথে লড়াই করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। একজন মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন

---

১. নাসিখ আল তাওয়ারিখ, হালাত ই রাসূলে খোদা (রাসূলুল্লাহ সা. এর অবস্থা), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৩

করছিলেন এবং তাঁরা মহানবীর শত্রুদেরকে তাঁর থেকে দূরে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। মহানবী আম্মারাহ ইবনে যিয়াদের দিকে লক্ষ্য করলেন, যাঁর দেহে চৌদ্দটি গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বললেন : 'আম্মারাহ নিকটে আস।' আম্মারাহ নিজেকে মহানবীর নিকট টেনে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর পায়ে কপাল রাখলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।[১]

মুসআব ইবনে উমাইর– ইসলামের ধৈর্যশীল প্রতিরক্ষক

মুসআব ইবনে উমাইর ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ সেই সকল যুবকের অন্যতম যাঁরা উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবাবেগে পরিপূর্ণ ছিলেন। যখন মহানবী (সা.) প্রকাশ্যে সকলকে ঐশী ধর্ম ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, তখন মুসআব এতে ইতিবাচক সাড়া দেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর থেকে তিনি ইসলামের প্রতিরক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন।

মুসআব ইবনে উমাইর একটি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। তারা তাকে দুনিয়ার যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ও বিলাস সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, কিন্তু মুসআবের আত্মা ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত জীবনের চিরকালীন বসন্তের খোঁজে ছিল। সুদর্শন দেখানো, সুন্দর পোশাক ও অলংকার পরিধান করার পরিবর্তে তিনি খুবই সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। সবাই তাঁর প্রশংসা করত এবং তাঁকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করত।

কিন্তু এসব কিছু তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল না। তিনি উচ্চতর কিছুর সন্ধানে ছিলেন। অবশেষে তাঁর তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাতে যান এবং আন্তরিকতার সাথে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পরিবার থেকে এসব কথা গোপন রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেন।

একদিন উসমান ইবনে তালহা মুসআবকে নামায পড়তে দেখেন এবং তাঁর মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে এ সম্পর্কে জানানোর জন্য যায়। তারা রাগান্বিত হয়ে তার মুখোমুখী হয় এবং মুসলমান হওয়ার জন্য এবং মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের জন্য অভিযুক্ত করে এবং এর ফলে তাঁকে বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রাখে। তিনি কিছুদিন

---

[১] তারিখে পায়াম্বারে ইসলাম, পৃ. ৩২৬

অবরুদ্ধ থাকেন যতদিন না তিনি পালানোর একটি সুযোগ পান। এরপর তিনি অপরাপর নির্যাতিত মুসলমানের সাথে ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। কিছুদিন ইথিওপিয়ায় অবস্থান করার পর তিনি অন্য হিজরতকারীদের সাথে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

যখন মদীনা থেকে হজের জন্য একদল লোক নবুওয়াতের দশম বর্ষের যিলহজ মাসে আগমন করেন তখন তাঁরা আকাবা নামক স্থানে একটি পূর্ণিমা রাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা একজন ধর্মপ্রচারককে তাদের সাথে প্রেরণের জন্য মহানবীর কাছে অনুরোধ করেন। মহানবী (সা.) তাঁদের মদীনায় প্রত্যাবর্তনের সময় মুসআবকে তাঁদের সাথে প্রেরণ করেন যাতে তিনি তাঁদের কাছে মহিমান্বিত কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাঁদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দেন।

মদীনায় যাওয়ার পর মুসআব খাজরায গোত্রের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আসআদ ইবনে যারারার বাড়িতে অবস্থান করেন। একদিন তিনি এবং আসআদ আওস গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ও আসআদের মামাতো ভাই সাদ ইবনে মাআযের বাড়িতে যান এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, তাঁকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবেন। মুসলমানরা মহিমান্বিত কোরআনের আয়াত শোনার জন্য আগ্রহভরে সাদের বাড়িতে জমায়েত হন। সাদ আওস গোত্রের আরেক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আসিদ ইবনে হুদাইরের দিকে ফিরে বললেন : 'এই দুই ব্যক্তি, যাদের ঈমান দুর্বল তাদেরকে বিপথগামী করার জন্য এসেছে। দ্রুত তাদেরকে আমার বাড়ি থেকে বের করে দাও। যদি আসআদ আমার মামাতো ভাই না হতো, তাহলে আমি নিজেই তার মুখোমুখি হতাম।'

আসিদ ইবনে হুদাইর একটি অস্ত্র নিলেন এবং তাঁদেরকে মোকাবিলা করার জন্য গেলেন। যখন আসিদ তাঁদের নিকটবর্তী হলেন তখন আসআদ মুসআবকে বললেন : 'এই ব্যক্তি তাঁর গোত্রের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁকে কি মুসলমান বানানো সম্ভব?' মুসআব বললেন : 'যদি তিনি কিছু সময়ের জন্য বসেন এবং আমি যা বলতে চাই তা শোনার জন্য কিছু সময় বসেন তাহলে আশা করা যায় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন।'

আসিদ বসতে অস্বীকার করলেন এবং মুসআব ও আসআদকে তিরস্কার করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন : ' তোমরা কি আমাদের মধ্যকার অজ্ঞ লোকদের বিপথগামী

করার জন্য এখানে এসেছ? ওঠ এবং আমাদের বাড়ির সীমানা ত্যাগ কর, যদি তোমরা জীবিত ফিরে যেতে চাও।'

মুসআব ইবনে উমাইর সম্পূর্ণরূপে নির্বিকারচিত্তে শান্তভাবে বললেন : 'আমি আপনাকে বসার জন্য এবং আমি যা বলতে চাই তা শোনার জন্য অনুরোধ করছি। যদি আমি যা বলি তা আপনাকে সন্তুষ্ট করে তাহলে আপনি তা গ্রহণ করবেন। যদি তা আপনাকে সন্তুষ্ট না করে তাহলে আপনি আমার কথা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে স্বাধীন।

মুসআব ইবনে উমাইর ছিলেন একদিকে সাহসী ও অন্যদিকে সুবক্তা। তিনি খুব অল্প কথায় ইসলামের সত্য কার্যকরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। এটি করার পর তিনি মহিমান্বিত কোরআনের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এই অল্প কয়েকটি আয়াত আসিদের ওপর এত গভীর প্রভাব ফেলল যে, কোন রকম বিলম্ব ছাড়া তিনি আসআদকে বললেন : 'কী সুন্দর ও উত্তম কথাই না তুমি পাঠ করেছ! এই ধর্মে যোগ দেয়ার জন্য একজনকে কী করতে হবে?'

এই দুই মুসলিম ধর্মপ্রচারক বললেন : 'প্রথমে আপনাকে গোসল করার মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করতে হবে এবং আপনার পোশাক ধুতে হবে। এরপর আপনাকে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিতে হবে এবং এরপর দুই রাকাত নামায পড়তে হবে।' যা বলা হলো আসিদ তাই করলেন ।

আসিদ সাদের কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা খুলে বললেন। আসিদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন শুনে সাদ ইবনে মাআয রাগান্বিত হয়ে গেলেন যে, তিনি খাপ থেকে তলোয়ার বের করে সেই দুই মুসলিম ধর্মপ্রচারকের প্রতি অভিশাপ দিতে দিতে ও তিরস্কার করতে করতে তাঁদের মুখোমুখি হলেন। মুসআব আসিদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন মাআযকে প্রভাবিত করা ও তাঁর ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্য একই পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন।

সাদ ইবনে মাআয মুসআবের কথা দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত হলেন। পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ তাঁর ওপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর সাদ দুইজন ধর্মপ্রচারককে ছেড়ে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে গেলেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : ' হে আবুল

আসহালের সন্তানগণ! তোমরা আমার সম্পর্কে কী মনে কর?’ তারা জবাব দিল : ‘আপনি আমাদের গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। আপনার রায়, ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা আমাদের সকলের চেয়ে অধিক।’ সাদ বললেন : ‘তাহলে তোমরা অবশ্যই জেনে রাখ যে, আজ থেকে তোমাদের কারো আমার সাথে কথা বলার কোন অধিকার নেই যতক্ষণ না সে একজন মুসলমান হয়– বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী।’ দিন শেষ না হতেই বনি আসহালের পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। তারা ছিল বনি আওসের বৃহৎ শাখাগোত্রসমূহের একটি। বনি খাযরাজেরও প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত ব্যক্তিরা ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুসআব ইবনে উমাইর বদর ও উহুদে অংশগ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধের সময় তিনি শহীন হন যখন তিনি মুসলমানদের পতাকা বহন করছিলেন। তাঁকে মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত হামযার কবরের পাশে দাফন করা হয়।[১]

মাআদ ইবনে আমরু– সম্মুখ সারীর বীর যোদ্ধা

মাআদ ইবনে আমরু ইবনে জুমুহ ছিলেন সালামা গোত্রের এবং মদীনার আনসারদের অন্যতম। তিনি আকাবায় উপস্থিত ছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মাআদ নিজেই বলেন : উহুদের যুদ্ধের সময় মুশরিকরা আবু জাহলকে ঘিরে রেখেছিল এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহকারে বলছিল : ‘আজকে কেউ আবু জাহলকে আক্রমণ করার সাহস পাবে না।’ এই কথা শুনে আমি কাফিরদের লজ্জিত করার জন্য আবু জাহলকে আক্রমণের পরিকল্পনা করলাম। অবশেষে আমি উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে গেলাম এবং তাকে এত জোরে আঘাত করলাম যে, তার পা কেটে দু'টুকরা হয়ে গেল। তাৎক্ষণিকভাবে আবু জাহলের ছেলে আকরামা তার তলোয়ার দিয়ে আমার ঘাড়ে আঘাত করল যাতে আমার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এটি আমার ঘাড়ের চামড়ার সাথে ঝুলতে লাগল। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা আমাকে আমার হাত সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ দিচ্ছিল না। তাই আমি সেই অবস্থাতেই যুদ্ধ করতে থাকি। অবশেষে আমি

---

[১] যুরকুলি, আল আলাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮; ইবনে সাদ, আত তাবাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮২; আল ইসাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০১; সিফাত আল সাফওয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২; উসদুল গাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৮; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬; ইবনে হিশাম, সীরাতে নাবাভীয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৪; নেহায়াত আর আরাব, পৃ. ২৩২; তারিখে পায়াম্বারে ইসলাম, পৃ. ১৮৫; আমতা আল আসমা, পৃ. ৩৫

বুঝতে পারলাম যে, এটি আমাকে সমস্যায় ফেলেছে। তাই আমি এটিকে অপসারণের চিন্তা করলাম। আমি এটি ছিঁড়ে ফেললাম এবং যুদ্ধ চালিয়ে গেলাম।' মাআদ খলিফা উসমানের সময়কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং ২৫ হিজরিতে মারা যান।[১]

ইয়াযীদ ইবনে হাতিব– সুখী ও সফল যুবক

উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম যুবকদের একজন ছিলেন ইয়াযীদ ইবনে হাতিব। যুদ্ধের সময় ইয়াযীদ ইবনে হাতিব মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাই তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে জাফর গোত্রের গ্রামে তাঁর বাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁকে দেখতে আসেন এবং বলেন যে, তাঁর অবস্থা খুবই সঙিন। সে মারা যাচ্ছে এটি বুঝতে পেরে তারা তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে বলল : 'তুমি কত সৌভাগ্যবান যে, জান্নাতে যাচ্ছ!' কিন্তু তাঁর মুনাফিক পিতা তার কপটতা গোপন করতে পারল না। সে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল : 'তোমরা আমার সন্তানকে কিসের ভালো খবর দিচ্ছ? জান্নাত তো কিছুই নয় শুধু ইসপান্দ বৃক্ষ ছাড়া।[২] আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি : 'তোমরা আমার সন্তানকে যুদ্ধে প্রতারিত করেছ।'[৩]

একজন যুবকের রাত্রিকালীন প্রার্থনা

আবায়া ইবনে রাবি বলেন, 'মদীনার আনসারদের মধ্য থেকে এক যুবক আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। এরপর তিনি নিয়মিত আব্বাসের কাছে যেতে লাগলেন, যিনি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কতিপয় ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে বললেন : 'এই যুবক যাকে তুমি তোমার কাছের করে নিয়েছেন সে মাত্র নয় বছরের কিশোর এবং তার অতিরিক্ত বদ অভ্যাস আছে। প্রতি রাতে সে

---

[১] ইবনে হিশাম, সিরাহ আন-নাবাভীয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮, তারিখে পায়ামবারে ইসলাম, পৃ. ২৬৮, যুরকুলি, আল আলাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮, আল ইসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৯

[২] হাতিব জান্নাতে ইসপান্দ গাছের সাথে তুলনা করেছে এজন্য যে, সেসময়ে মদীনার মরুভূমিতে ও জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে প্রচুর পরিমাণে এ বৃক্ষ ছিল। সুতরাং সে বোঝাতে চেয়েছিল যে, জান্নাতের কোন অস্তিত্ব নেই, কেবল ইসপান্দ বৃক্ষের অস্তিত্ব রয়েছে, যে মাটির নিচে তাঁকে সমাহিত করা হবে।

[৩] ইবনে হিশাম, সিরাতে নাবাভীয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৩; সীরাতে পায়গাম্বর, পৃ. ৩৩২

কবরস্থানে গিয়ে কবরসমূহ উন্মুক্ত করে।' ইবনে আব্বাস আশ্চর্য হয়ে বললেন : 'যখন তোমরা তাকে কবরস্থানে যেতে দেখ তখন আমাকে খবর দিও।' এক রাতে যখন তাকে কবরস্থানে যেতে দেখলেন তখন ইবনে আব্বাসকে খবর দিলেন। ইবনে আব্বাস সেখানে গিয়ে এমন একটি জায়গায় লুকালেন যেন কিশোরটি তাঁকে দেখতে না পায়। কিশোরটি একটি কবরের ওপর মুষ্টাঘাত করে বলল : 'আফসোস আমার জন্য! যখন আমি কবরে একা এবং মাটি আমার বিছানা হবে তখন এটা আমাকে বলবে : 'তুমি সাদরে অভ্যর্থিত নও। এখানে তুমি অনাহূত/ তোমার এখানে থাকা উচিত নয়।' আফসোস এর জন্য যা আমার হৃদয় থেকে বের হয়ে এসেছে। আফসোর আমার জন্য যখন আমি দেখি নবিগণ ও ফেরেশতাগণ একই সারিতে! পুনরুত্থানের দিন কে আমাকে আল্লাহর ন্যায় বিচার থেকে রক্ষা করবে? কে আমাকে পাপীদের ওপর প্রদত্ত শাস্তি ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করবে? কে আমাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? আমি তাঁর অবাধ্যতা করেছি যাঁর অবাধ্যতা করা উচিত ছিল না। যখনই আমি কোন প্রতিজ্ঞা করেছি তা ভঙ্গ করেছি। আমি তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার পালনে বিশ্বস্ত ছিলাম না!

কিশোরটি এই কথাগুলো বলছিল ও অঝোরে ক্রন্দন করছিল। যখন সে কবরস্থান থেকে বের হয়ে আসল তখন ইবনে আব্বাস তাঁর সামনে আসলেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি তাঁকে বললেন : 'কত জ্ঞানী তুমি যে, তোমার পাপসমূহ কবরের কাছে প্রকাশ করেছ।'[১]

(চলবে)

সংকলন ও অনুবাদ : মিকদাদ আহমেদ

('জাভা'নানে নামুনেয়ে সাদরে ইসলাম' গ্রন্থ থেকে সংকলিত)

---

১. সাদুক, আল আমালী, মাজলিশ ৫৩, হাদিস ১১, বিহারুল আনওয়ার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩১, হাদিস ২৪